20

আশুতোষ কলেজ পত্রিকা

1997-98

শিক্ষাবর্ষ ১৯৯৭—৯৮ ❑ বার্ষিক সংখ্যা

সম্পাদকীয়

কেমন আছো বন্ধুরা? প্রত্যেকে ভালো থাকো, এটাই প্রত্যাশা। জানি তোমাদের খুব রাগ হয়েছে, পত্রিকা প্রকাশে দেরীর জন্য। কিন্তু কি করি, উজান ঠেলে এগিয়ে আসতে লাগলো অনেকটা সময়। আর, সেইজন্যই ১৯৯৭-৯৮ শিক্ষাবর্ষের আশুতোষ কলেজ বার্ষিক পত্রিকা প্রকাশমুহূর্ত বিলম্বিত হলো। অবশ্যই প্রাণ খুলে দোষ দিতে পারো আমাদের—এ অধিকার তোমাদের আছে। কিন্তু আমরা জানি তোমরা আমাদেরই সঙ্গে আছো ও থাকবে।

ভর্তি সমস্যা, শিক্ষার পিরামিড স্ট্রাকচার আর নিঃশেষিত সময়ের ক্ষয়াটে মূল্যবোধ, আদর্শহীনতা ও আরও অনেক সমস্যার মধ্যে লড়াই চালাতে হচ্ছে আমাদের। আমরা প্রত্যেকেই বোধহয় শেষ হচ্ছি এক-একভাবে। তবুও এই বিপন্ন সময়ে কিছুক্ষণের জন্য যদি মনে হয়—আমাদের হারাবার কিছু নেই, কিন্তু জয় করার জন্য সমস্ত পৃথিবীটাই আছে। তাতে ক্ষতি কি? তাই এই সাংস্কৃতিক প্রয়াস—এই পত্রিকা। স্যাটেলাইট চ্যানেলের যুগে কিছুটা ঘুরে দাঁড়ানো। জীর্ণ সময়ে সংলগ্ন ভাবনাতেও আসে অস্পষ্টতা, আবার কখনো তা তীব্র ও তীক্ষ্ণ প্রতিবাদ হয়ে ওঠে। সেই ভিন্ন অনুভূতি, রাগ, ক্রোধ আর ভালোবাসার কোলাজ—আমাদের এই পত্রিকা।

"যে বালিকা ভেবেছিল উড়ে যাবে তারাদের দেশে / সে এখন ভাত রাঁধে মাইক্রোওয়েভে।"— তবুও আমরা সেই বালিকাকে ফিরিয়ে আনার স্বপ্ন দেখি। কারণ হেরে যাওয়াটা ঠিক ভালো লাগে না। স্মৃতি-ফলকের স্থবিরতা বড়ো দুঃসহ লাগে। তাই পারলে কাটাতার ছেঁড়ো। আগুন জ্বালো। আগুনে জ্বলো। শুদ্ধ করো এ সময়কে।

বাতাসে একটা আগুনে-আঁচ আছে, এখনও। মনে হচ্ছে দূরে কোথাও মাদল বাজছে। চারপাশের মেঘে কাঁপন...খুব বৃষ্টি পড়বে মনে হয়। হয়তোবা এ রক্তেরও বৃষ্টি হতে পারে। যে ক্ষরণের প্রবাহ চলছে অন্তরালে শুধু তার উৎসারণের অপেক্ষা।

আরো মেঘ চাই। আরো বৃষ্টি চাই।

তাই, কাঙ্খিত রক্তপলাশ দিন হোক সংহতির দিন—বন্ধুত্বের দিন। তোমাদের প্রতিটা দিন যেন হয় স্নিগ্ধ সকাল, প্রখর দুপুর আর রজনীগন্ধার রাত্রির যাপন।

বন্ধুর হাতে হাতটা রাখো। কালো সময়কে ছিন্ন করো, ভালোবাসায়।

সুপ্রিয় বেদজ্ঞ
সাধারণ সম্পাদক
আশুতোষ কলেজ ছাত্র সংসদ।

১৯৯৭-৯৮, শিক্ষাবর্ষ

প্রতি বছরের মতো এবারও আশুতোষ কলেজ ছাত্রসংসদ তাদের বার্ষিক পত্রিকা প্রকাশ করছে। ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে যে সুপ্ত প্রতিভা আছে, তা স্ফুরণে উৎসাহ দেওয়ার জন্যই এই পত্রিকা। অন্যান্য বছরের ন্যায় এ বছরও বেশ কিছু লেখা পাঠকদের খুশী করবে এই আশা রাখি। আগামী দিনে আরো বেশী সংখ্যক ছাত্রছাত্রীকে তাদের প্রতিভার স্বাক্ষর আঁকতে উদ্বুদ্ধ করলে এই পত্রিকা তার মূল দায়িত্ব পালনে কৃতকার্য হয়েছে মনে করবো।

আশুতোষ কলেজের ঐতিহ্যের ধারাবাহিকতা বজায় রেখেএই সুন্দর পত্রিকা প্রকাশের জন্য ছাত্র সংসদকে আন্তরিক অভিনন্দন জানাই।

যে প্রত্যয় নিয়ে এই পত্রিকা প্রকাশিত হচ্ছে তা সকলের কাছে সমাদৃত হবে এই আশা রাখি।

শ্রী সুধীন্দ্র কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়
ভারপ্রাপ্ত অধ্যাপক
আশুতোষ কলেজ। কোলকাতা ২৬

।। অক্টোবর ১৯৯৮।।

ASUTOSH COLLEGE STUDENTS' UNION

92, SYAMAPROSAD MOOKHERJEE ROAD, CALCUTTA-700 026

YEAR—1997-98

President :
Prof. Smt. Raikamal Dasgupta

Vice-President :
Bappaditya Roy

General Secretary :
Supriyo Bedanja

Asst. General Secretary :
Kasturi Ganguly
Saran Guptoo

Jt. Cultural Secretary :
Animitra Chakraborty
Ritabrata Banerjee

Asst. Cultural Secretary :
Swati Mukherjee
Trinabrata Das

Magazine Secretary :
Mou Roy

Asst. Magazine Secretary :
Sukanya De

Jt. Games Secretary :
Sukanta Roy
Sarbojit Mazumdar

Asst. Games Secretary : (Outdoor)
Sukanta Bardhan
Bapi Bhattacharya

Asst. Games Secretary : (Indoor)
Subhashish Dey
Sagar Dutta

Common Room Secretary :
Indranil Basu Mazumdar

Library Secretary :
Soumit Roychowdhury

Jt. Canteen Secretary :
Sougata Maity
Souvik Dasgupta

Students Welfare Secretary :
Abhishek Roy

Hostel Secretary
Agnimitra Das Adhikari

সূচীপত্র

☐ বাংলা কবিতা : (পৃষ্ঠা, ১—৭) : ওচিস্মিতা সরকার ● নীহাররঞ্জন জয়ধর ● সুমন কুন্ডু ● অনুজ গাঙ্গুলী ● অধ্যাপিকা রাইকমল দাশগুপ্ত ● সুমন দাস ● সুমন্ত চৌধুরী ● নবীন ঘরামি ● কাজল দাস ● অনুপম সাহা ● সৌমেন চক্রবর্তী ● সন্দীপন চন্দ ● জয়ীতা গোস্বামী ● সুপ্রতিম দে ● সুভাষ চন্দ্র ভাণ্ডারী ● অর্ঘ্য বসু ● অধ্যাপিকা কৃষ্ণা বসু ● তন্দ্রিমা বসু ● প্রদীপ কুমার শীল ।

☐ বাংলা গল্প : (পৃষ্ঠা, ৮—১৩) : সুচিস্মিতা সরকার ● সুচরিতা দে ● ওভাশিষ কুমার দে

☐ বাংলা প্রবন্ধ : (পৃষ্ঠা, ১৪—২১) : অধ্যাপক তপন কুমার বিশ্বাস ● অনিন্দিতা ব্যানার্জী ● রিতাশীষ ভট্টাচার্য্য

☐ শব্দ সন্ধান : সমস্যা (পৃষ্ঠা, ১৮) সমাধান (পৃষ্ঠা, ২১) : সোমরাজ ঘোষ।

☐ ইংরাজী কবিতা : (পৃষ্ঠা, ২২—২৩) : শিবেন্দু চক্রবর্তী ● ওচিস্মিতা মুখার্জী ● অমর্ত্য পাল ● রাজীব চ্যাটার্জী ● সুকন্যা দে

☐ ইংরাজী প্রবন্ধ : (পৃষ্ঠা, ২৪—২৯) : কস্তুরী গাঙ্গুলী ● সৌজাত্য গুই ● অধ্যাপক সুকান্ত আচার্য্য

☐ সসেদ বার্তা : (পৃষ্ঠা, ২৯)

☐ প্রচেষ্টা : (পৃষ্ঠা, ৩০)

☐ প্রচ্ছদ বিষয় : বন্ধুত্বের দিন—সংহতির দিন ● প্রচ্ছদ অলংকরণ : সুপ্রিয় বেদজ্ঞ ও সুমন কুন্ডু

'স্বপ্ন আমার কবিতা'

শুচিস্মিতা সরকার, রাশিবিজ্ঞান বিভাগ, দ্বিতীয় বর্ষ

হয়তো বা হাজার বছর পরে,
নিবাস যখন তোমার
লুব্ধক নক্ষত্রের কাছে—
পৃথিবীর সবুজ ঘাসে মিশে গিয়ে
স্বপ্নে আমি দেখবো তোমায়।
অথবা আরো অনেক দূরে,
জন্ম নেবো আমরা আবার—
একসাথে—
কোনো এক যুবতী ধরিত্রীর গর্ভ হতে নেমে।
অনাবিল বিস্ময়ে লীন হয়ে যেতে যেতে
আবারও দূরতর কোনো মাধুর্যের কথা ভেবে যাবো।

চাইনা প্রতিকার সুখ

নীহাররঞ্জন জয়ধর; বাংলা বিভাগ, দ্বিতীয় বর্ষ

শান্ত-জীবন্মৃত
বৃত্তের পরিধিতে চলছে সনতল ভূমির জল
ইলেকট্রন-প্রোটন আর দু-পেয়ো জ্যান্ত শরীর—
মাতৃজঠরের অন্ধকার থেকে মুক্তি পেয়েই—
ছুটছে দুই উঁচু পাড়ওয়ালা গভীর সরু আলের
মহাধমনী বেয়ে।

নেই দুকূল ছাপিয়ে যাওয়ার কোন অশান্তি
যদিও কারও করা গর্ত দিয়ে উঁকি দেওয়ার,
বাইরে যাওয়ার চেষ্টা করা হয়—
শিরার রন্ধ্রে পৌঁছোনোর কোন ধৃষ্টতা
তৎক্ষনাৎ মহাসনারোহে চলে সেই পাতককে,
মিটিয়ে দেওয়ার আয়োজন।
পাথর-কংক্রিট, জ্যান্ত দানবের কোমল-কঠোর
লোভের তির্যক আঙুলি, রক্তচক্ষু।
বর্জন-গ্রহনের কোন কঠিন অভীপ্সা নেই
ওসব ব্যতিক্রমী সূত্র।
তাই অনুকরণ করে-সৃষ্টি করে
অনাসৃষ্টি হওয়া-নিছকই গ্লানি পাওয়া
ব্যাসের দৈর্ঘ্য বেশী-কম হতে পারে
কিন্তু সহনসীমা লঙ্ঘিত হবে না।
হয়ত
প্রথম যৌবনের নষ্ট-আশা
কখনও নেহাৎ ভাবের ঘোরে চিৎকার ওঠে
কিন্তু তা যে 'বড়' বেসুরো
তাই বাহবা না পেয়ে হঠাৎ প্রজ্বলিত শিখা
কাননে শান্তি সমাধি লাভ করে,
প্রবল স্রোত, ভাঙার নেশায় মাতোয়ারা
হয়ে যদিও বৃত্তের রেখাকে চুঁশ মারে।
কিন্তু পীড়নে
বিকৃত অবস্থা জন্মে আসে ফিরে।
কোথায় কচি ঘাস-লাল সূর্যের রেনু-
কোথায় বাবুই পাখীর কাঁচাঘরের নেশা।
বৃত্তে চলাই সুখ
প্রতিকারহীন সুখ।

তবুও মাঝে মাঝেই বেনুর নেশায়
সাঁওতাল ভিহির অমৃত পান করে লক্ষ লক্ষ নোংরা জন্তু
প্রবল আর্তনাদে কেঁপে ওঠে—
শাশ্বত প্রেমিকরা ওষ্ঠাধর চুম্বনে অমরত্ব লাভ করে
কৃষ্ণচূড়ার গন্ধে মাতোয়ারা হয়ে ওঠে
এই দাঁড়াও
তোমার হাতটা তুলে রাখ
আমিও যাব তোমাদের সঙ্গে।

সীমানা

সুমন কুণ্ডু : প্রাক্তন ছাত্র

শহর, আজ অনেকদূর গড়িয়েছে
বৃষ্টি, তুমি লাগাও তোমার নিশানা।
ইতিহাস, আজ মানুষ হতে শিখেছে,
দেশ, তুমি বাড়াও তোমার সীমানা।।

আকাঙ্ক্ষা

অনুজ গাঙ্গুলী ; শিক্ষাকর্মী

আমি চেয়েছিলাম,
ছোট্ট ঝোপটার দোয়েল হ'য়ে শিষ্ দিয়ে,
উদাসী মনে সাড়া জাগাবো।
ঝোপ থেকে ঝোপে, এখানে-ওখানে
ঘুরে বেড়াবো আর শিষ্ দেবো।
কিংবা সুন্দর গেরো হ'য়ে
সুদূর আকাশে ঘুরে বেড়াবো
আর ডানা ঝাপটাবো।
সীমানা পেরিয়ে চলে যাবো
দেশ থেকে দেশান্তরে।
সীমানার প্রহরীরা চাইবে না
কোন ছাড়পত্র
স্বাধীনতায় বাধা দেবে না কেউ।
মিটবে আমার নেশা-
আনন্দে মেতে, মাতিয়ে দেবো।
চমকে উঠলাম,
কারও টিয়ার রাইফেল কিংবা অগাধ লোভ
কেড়ে নেবে আমার প্রাণটা,
মৃত্যু ভয় আমায় তাড়া ক'রে ফিরুক
আমি চাই না,
চাই না আমি মুক্ত বিহঙ্গ হ'তে।
আমি চেয়েছিলাম,
সুন্দর প্রজাপতি হয়ে
ছোট্ট শিশুর মন-ভোলাতে,
ফুলের আমন্ত্রনে সাড়া দিয়ে
পরাগ মিলনে সাহায্য করতে—
বাধাহীন আনন্দের টানে।
ফুলেদের আমন্ত্রন আজও ছিল,
কিন্তু আমার যাওয়া হ'ল না।
পরাগমিলন তখন কৃত্রিমতায়,
আরও ছিল বাধা-
কীটনাশকের উন্মাদনা।
প্রজাপতি হ'তেও চাই না আমি,
সুন্দর স্বাধীন হ'তে চাই না আর।
বুঝি বা সুন্দরের প্রাণ নেওয়ার
প্রয়াস চলেছে অবিরত—
নিত্য নতুন ভাবে।
চাই না আমি সুন্দর হ'তে,
মুক্ত হ'তেও চাই না আর,
মরতেও চাই না আমি,
বেঁচে থাকতে চাই এই সুন্দর পৃথিবীতে।

নবীনবরণ উৎসব উপলক্ষ্যে

অধ্যাপিকা রাহিকমল দাশগুপ্ত ; ইংরাজী বিভাগ

নবীন কিশোর কিশোরী তোমাকে দিলাম—
বিরল মনের খবর নতুন প্রাণের,
তুখোড় সওয়াল, দুরন্ত ইংরাজী,
বহু ব্যাখ্যাও, বহু আঘ্রাত কবি—
জীবনকে নিয়ে খেলেছেন যারা বাজি।
পরিপাটি কোনও সমীক্ষা, বাক্-ছবি
শব্দের ব্যবহারের স্বকীয় ভঙ্গী,
নিকটতা বোধ, চিন্তার কোনও ফুলকি,
ভাললাগা বই—শিয়রের কাছে সঙ্গী।
ধ্রুপদী বাক্যবন্ধের খান ইঁট,
সূক্ষভাবের আলো-আঁধারির আফরি,
মৃত লেখকের নাম খুঁটে খাওয়া কীট।
অজানা পথের অভিযাত্রীর সফরে
তোমরাই পারো দেখাতে নতুন ভেলকি
আনন্দ-অনুভবের শরিক তোমাদের
আমার আজ আত্মীয় ক'রে নিলাম।

নীল প্রতীক্ষা

সুমন দাস ; বাংলা বিভাগ, দ্বিতীয় বর্ষ

এই নিবিড় নিশীথে নীল হিমেল হাওয়ার
স্পর্শ টের পাচ্ছি
অথচ তবুও যেন গোলাপী গন্ধে বিভোর আমি।
আমার প্রত্যাশা, আমার প্রতীক্ষা, যেন কিছু বলতে চাইছে
কিছুটা স্পষ্ট, কিছুটা অস্পষ্ট...
সেই নীল হিমেল হাওয়া—সেই গোলাপী গন্ধ—
হে মানবী কী চাও তুমি?
বাতাসও স্তব্ধ, তুমিও স্তব্ধ—
নাকি বহুদিন সেই চেনা সুবাসটি
তোমায় ছুঁয়ে যায়নি বলে,
নাকি বহুদিন সেই উত্তাপ অনুভব করনি বলে,
বেরিয়ে এস, বেরিয়ে এস বলছি।
না পারলে বিশ্বাসের হাত ধর,
আশ্বাসের শ্বাস নাও।
আমি তো জানি—
কত স্বচ্ছ তোমার প্রতীক্ষা,
কে তোমার প্রতীক্ষা।

'ইউ আর আন্ডার এ্যারেস্ট'

সুমন্ত চৌধুরী; ভূগোল বিভাগ, দ্বিতীয় বর্ষ

স্বাধীন দেশের স্বাধীন নাগরিক তুমি
পুলিশের পিস্তল তোমার ঘাড়ে বলে ওঠে না
'ইউ আর আন্ডার এ্যারেস্ট'।

ভাবছো কি তুমি মুক্ত?
মায়ের কোলে যেদিন তুমি এসেছিলে এ পৃথিবীতে
সেদিন কেঁদেছিলে আতঙ্কে
পঞ্চভূত তোমার দিকে পিস্তল তুলে বলেছিল
'ইউ আর আন্ডার এ্যারেস্ট'।

আজ তুমি নবীন, ছুটছো সামনে
সকল রকম বাধাকে টপকে।
তবুও 'ইউ আর আন্ডার এ্যারেস্ট'।
এ্যারেস্ট তুমি নিজের কর্মকান্ডে
হয় সিলেবাসের বোঝায়, না হয় প্রেমে।
হবে তুমি পুরাতন
তখন সামাজিক বন্ধন তোমায় শোনাবে
'ইউ আর আন্ডার এ্যারেস্ট'।

তারও পরে তুমি পারিবারিক বোঝা
আর তখন স্বয়ং ভগবানের হাতে থাকবে পিস্তল—
'ইউ আর আন্ডার এ্যারেস্ট'।

বাগান বাড়ী

নবীন ঘরামী ; বি.এ, দ্বিতীয় বর্ষ

ওই যে রাস্তার ধারে
যখন নতুন বাগান বাড়ীটা তৈরী হয়ে যাবে,
তখন প্রথম সূর্যের আলোটা এসে পড়বে
আমাদের ঘরে।
সব অন্ধকার দূর থেকে দূরান্তে চলে যাবে।
সকালে যখন বসবো আমরা
নতুন বাগানে
সদ্য গজিয়ে ওঠা দুর্বাগুলির অভিবাদন গ্রহণ করবো
আমরা দুইজনে।
যখন ভাববো তোমার কথা
আমার কর্মস্থলে।
তখন তুমি হয়তো বা ব্যস্ত আছো
সংসারের কাজে।
বিকেলের পড়ন্ত রোদের দিকে চেয়ে
আমার আগমনের সময় গুনছো
যখন আমি ফিরবো কর্মস্থল থেকে
লাভ-ক্ষতির হিসাব কষতে-কষতে
আমরা চুমুক দেবো এক পেয়ালা চায়ে
ঐ যে রাস্তার ধারে বাগান বাড়ীর
নতুন সাজানো বাগানে।।

আমার কল্পনা

কাজল দাস; বি.এস.সি , দ্বিতীয় বর্ষ

যখন প্রথম তোমাকে দেখেছি ভোরের প্রথম আলোয়,
আমার মনে হয়েছিল তুমি যেন স্নিগ্ধ কোমল, স্বচ্ছ,
আলো নিয়ে এসে দশ দিগন্তকে আলোয় উদ্ভাসিত করলে।
এটা কী তুমি সত্যি ভাবলে।
এটা সত্য নয় এটা আমার প্রথম তোমাকে দেখার কল্পনা।

যখন তোমার সঙ্গে আমার প্রথম পরিচয়,
তখন মনে হয়েছিল অনেক দিনের তৃষ্ণার
অবসান হল আমার
এটা কী তুমি সত্যি ভাবলে।
এটা সত্য নয় এটা আমার প্রথম
তোমার সঙ্গে পরিচয়ের কল্পনা।

যখন তোমার প্রথম সঙ্গ পেলাম,
তখন মনে হয়েছিল শরতের প্রথম নির্মল—
বাতাসের শিউলির গন্ধের চিরচরিত মিলনের আহ্বান।
এটা কী তুমি সত্যি ভেবেছো।
এটা সত্য নয় এটা আমার কল্পনার পরিনাম,

যখন তোমাকে প্রথম স্পর্শ করলাম,
মনে হয়েছিল গ্রীষ্মের দ্বিপ্রহরের উৎকণ্ঠা হৃদয়ে—
তীব্র ঠান্ডা বাতাসের শান্তির অনুভূতি।
এটাও কী তুমি সত্যি ভাবলে।
এটা সত্য নয় এটা আমার তোমাকে প্রথম ছোঁয়ার কল্পনা।

'যুগান্তর'

অনুপম সাহা

রঙের খেলা লাগিয়ে
নতুন সূর্য উঠছে আকাশে,
ভেবে নেওয়া যায়—ভোর হচ্ছে।
পুরোনো আকাশে নতুন তুলির প্রলেপ,
চিত্র ভাবনাগুলো সতেজ হয়ে ওঠে—
ইন্দ্রালেহ্‌যুয়ালদের মতো।

হৃদয় উত্তপ্ত করে এখন
মধ্য আকাশে দিবাকরের আনাগোনা,
ভোরাই রঙিন মনটা-
অভিজ্ঞতার চাপে ফিকে হয়ে আসে।
অন্বেষণের আলেয়াতে
সুলগ্নার ছবিটা ভেসে ওঠে,
কিন্তু মিলিয়েও যায়।
তাহলে কি সেও মরীচিকা?

অবশেষে আবার রঙের অস্তিত্ব-
যে অস্তিত্ব-সারাটা সময় ধরে ঘষা আর মাজা,
হৃদয় শান্ত হয়, কিন্তু উত্তাপের
নীলাভতা কাটে না।
তবু ও তো-স্বপ্নের মৌতাত লাগিয়ে
আমরা এগিয়ে চলি
আবার একটা নতুন দিনের স্বপ্নে।

স্বপ্ন দাও

সন্দীপন চন্দ ; প্রাক্তন ছাত্র

হে মাটি, রূপ দাও
জুড়োক মানুষের চোখ
হে আকাশ, নিঃসঙ্গতা দাও
মানুষ একটু ঘুমোক...
হে সমুদ্র, তুমি ডাক দাও
মানুষী কান পাতুক ;
ফেনিল মাথাগুলো বালিতে মিশে যাক
হাতগুলো কুড়োক ঝিনুক।

হে মানুষ, তুমি স্বপ্ন দাও ;
বন্দরে সে বাঁচবেই...
শিকড়ে লাগুক টান, আরও আরও টান
রক্ত ঝরুক, ক্ষতি নেই।

জীবন পথের বাঁকে

সৌমেন চক্রবর্তী; রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ, তৃতীয় বর্ষ

জীবন পথের বাঁকে কত আলো নিভে যায়
কত নদী অন্য পথে ধায়
শুধু কমল-সুমির মত আলোক দ্যুতিগুলি
আকাশের বুকে নতুন করে রঙ ঝরায়।

জীবন পথের বাঁকে
কত তারারা মুখ তুলে চায়
লাস্যময়ীরা একে একে মুছে যায়
আলো-আঁধারি খেলায়
শুধু কমল-সুমির মত আলোক দ্যুতিগুলি
পথ দেখায়।

জীবন পথের বাঁকে
কত না ফিঙে, দোয়েল, কোয়েল ডেকে যায়
পলাশের রঙে—
কতবার বসন্ত বুক রাঙায়,
সব রঙ মুছে যায়,
সময়ের ভেলায়।
শুধু কমল-সুমির মত রঙবিহীন
ভালবাসা রয়ে যায়।

জীবন পথের বাঁকে
সব রঙ মিশে যায়
সব আলো নিভে যায়
অন্ধকার আশ্রয় চায়
শুধু কমল-সুমির মত অপ্রতিভ
আলোগুলি মুখ তুলে চায়।।

অতিক্রম

জয়ীতা গোস্বামী ; বাংলা বিভাগ, তৃতীয় বর্ষ

অতীতটা ফিকে হয়ে আসে, মধ্যাহ্ন বেলা তখন ;
অতিক্রম করে যাই, শর্ত সাপেক্ষ সব কিছু।
কমলালেবু দুপুর আর বিকেলের রোদে পিঠ পেতে
কখনো শীতের সন্ধেতে অথবা হঠাৎ বৃষ্টিতে
সূর্যস্নান মনে করে বসন্তের দিন মনে পড়ে।
জোছনা প্রান্তরে পথ হারানো
নিঃসঙ্গ রাখালের বাঁশিতে,
বরফ অন্ধকার ভেঙে উষ্ণতা পাবো বলে ছুটে যাই।

বাবরী কাহিনী

সুপ্রতিম দে; প্রাক্তন ছাত্র

উদ্ভ্রান্ত এই বিজ্ঞানের যুগে
বিদ্যা যখন নিজের প্রতি অসন্তোষে
নিজের চুলগুলোকে বার বার উল্টো দিকে আঁচরাচ্ছিল।
তার সেই ঘন ঘন কেশবিন্যাসের দিনে
বিদ্যার বাবার আদেশে
কাঁচি ও খুরের ধারা বিদ্যার মস্তকের বুক থেকে
ছিনিয়ে নিয়ে গেল তোমার কেশরাশী।
বাঁধলে তোমাকে সেলুনের চেয়ারে
কাঁচি চিরুনী ও খুরের নিবিড় পাহারায়
যেখানে বিদ্যা প্রতিদিন চিনছিল নিজের চুল
চিনছিল সেলুন সেলুনের নেমপ্লেট
যা মন্ত্র জাগাচ্ছিল বিদ্যার চেতনাতীত মনে
সাবান দিচ্ছিল চুলে
চাচ্ছিল চুলগুলোকে ব্যাকব্রাশ করতে
আপনাকে উগ্র করে আয়নায় দেখছিল
নিজের ভয়ঙ্কর রূপ
চেঁচাচ্ছিল তান্ডবের দুন্দুভিনাদে।
তার কেশাবৃতা
অন্ধ চুলের আড়ালে অপরিচিত ছিল তোমার
গোলাকার মস্তক
সাইজ যার কদবেলের মত
এলো ওরা লোহার ছুরি কাঁচি নিয়ে
এলো যত চুল চাঁচার দল
চুল কাটার প্রচন্ড উত্তেজনায়
নগ্ন করল তাদের খুরের ফলা
তোমার ভাষাহীন ক্রন্দন কেউ শুনলো না
তোমার ভিজে চুলগুলো ছড়িয়ে পড়ল সেলুনের
মেঝেতে।
তার আগে তোমার কেশসাগরের পারে
উকুনের পাড়ায় পাড়ায় বাজছিল জয়ঘন্টা
সকাল সন্ধ্যায় দয়াময় বিদ্যার নামে
আজ যখন আক্রান্ত মস্তকে
বইছে প্রলয়কালের ঝঞ্ঝাবাতাস
তখন লুপ্ত গহ্বর থেকে বেরিয়ে এলো ডেঁয়ো
উকুনেরা
অতন্ত ধ্বনিতে ঘোষণা করল নিজেদের অন্তিম কাল
বলল
এসো যুগান্তের কাপালিক
আসন্ন বিনাশের শেষ সময়
দাঁড়াও এই মানহারা মস্তকের পারে
বলো আবার গজাক নতুন কেশ
এই হোক তোমার শেষ পুন্যবাণী।

আজগুবি

সুভাষ চন্দ্র ভান্ডারী; বাংলা বিভাগ, দ্বিতীয় বর্ষ

আজগুবি সব আজগুবি সব,
আজগুবি সব গল্প।
শহর টাতে ভুলের থেকে,
মানুষ ছিল অল্প।।
কুকুর ছিল বানর ছিল—
ছাগল ছিল যারা,
মানুষ কি পুষবে তাদের?
মানুষকে পুষতো তারা।।
মানুষ ছিল তাদের গোলাম,
হাল করত মাঠে।
ঘর পাহাড়া দিত তারা,
রাস্তাতে দিন কাটে।।
সেথায় ছিল দিনে আঁধার,
রাত্তিরেতে আলো।
ভালো জিনিস খারাপ লাগে,
সাদা জিনিস খারাপ লাগে,
নাক দিয়ে যে খেত তারা,
দেখত কানটি দিয়ে।
বাঁচতো তারা হাজার বছর,
সঙ্গীনী না নিয়ে।।
আনাজ পত্তর কুটে তারা—
রাখত লোহার কড়ায়।
পেলাসটিকের ঝুড়িটাকে
উনুন মুখে বসায়।।
উন্নত যে ছিল তারা—
এটা যেমন মিথ্যা।
খেত তারা মানুষের মাংস
করে তাদের হত্যা।।

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

সম্পাদনায় বিশেষভাবে সাহায্য করেছেন—

অধ্যাপক অমল কুমার চক্রবর্তী
অধ্যাপক অমৃতাভ বন্দোপাধ্যায়
অধ্যাপিকা রাইকমল দাশগুপ্ত।

ভালোবাসা

অর্ঘ্য বসু ; উদ্ভিদবিদ্যা বিভাগ , তৃতীয় বর্ষ

আজকে অনেকদিন পর
আমি এক বৃষ্টির সম্মুখীন
রাত বেড়ে যায়, তবুও সময়
জলের সুডৌল কণায় নিরুদ্দেশ
শুধু মনে পড়ে যায় তাকেই ভালো বেসেছিলাম
দু-একটা সন্ধে সে হেঁটেছিল আমার পাশেপাশে
ভেবেছিলাম ভালোবাসে
তার হাত ছুঁয়ে দিয়ে তারাদের চোখে
রেখেছিলাম চোখ
নীল আলো দিয়ে সেই নক্ষত্ররা
বলেছিল ভালোবাসা এইখানে হোক।।

কবিতা যেমন

অধ্যাপিকা কৃষ্ণা বসু : বাংলা বিভাগ

কবিতা সেতো ঝড়ের আগে স্তব্ধ নিসর্গ
কবিতা সে তো আকাশের বুক চিরে
নেমে আসে বিদ্যুৎকণা
ছালিয়ে করে দেয় নস্যাৎ

কবিতা সেতো মায়ের মধুর হাসি
আর প্রিয়ার লোভেন ব্রীড়া

কবিতা ফোটায় জীবনের গাছে সচেতনতার ফুল
আর মশাল জ্বালে আমার বুকে
শবসাধকের মতো ব্যভিচারী লিপ্সা
হঠাৎ কখনো এলোমেলো সুরে
বেজে ওঠে প্রাণের ছিঁড়ে যাওয়া তারে

কবিতা তো নির্দ্বিধায় মরতে শেখায়
মারতেও।

ধ্বংসের সম্মুখে

তন্দ্রিমা বসু ; রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ, দ্বিতীয় বর্ষ

তথাগত চোখ মেলে তাকালেন
তিনি হাসছেন—স্নিগ্ধ প্রশান্ত তার মুখমণ্ডল
হঠাৎ স্মরণে এল তার জন্মতিথি।
সেদিন শুদ্ধোধন হেসেছিলেন— গৌতমী হেসেছিলেন
সমগ্র কপিলাবস্তু নগরী হেসেছিল
আনন্দে উদ্বেল হয়েছিল হিমালয় পর্বত।
স্মৃতির পর্দা ভেসে এল
বারাঙ্গনা সুমিত্রার লাস্যময়ী অবয়ব
মায়ের কোলে বড় হওয়া রাজপরিবারের স্মৃতি
খুশী করল তাকে
পূর্ণিমা তিথির চাঁদ দেখে তিনি আপ্লুত হলেন
তথাগত মৃদু হাসলেন।
পুনরায় ধ্যানস্থ হতে যাবেন, অচকিতে বিস্ফোরণ
এক-দুই-তিন
তথাগত শুনলেন—বিচলিত হলেন
ধ্যান অচিরেই ভঙ্গ হল তার
তিনি দেখলেন শুদ্ধোদন কাঁদছেন, গৌতমী কাঁদছেন
কপিলাবস্তু নগরী কাঁদছে।
সুনিত্রার বিবর্ণ পাণ্ডুর চেহারা।
পোখরান জ্বলছে—ভারতমাতা অসহায়া
সমগ্র বিশ্ব আঙুল তুলে ধিক্কার জানাচ্ছে
কোটি কোটি নিরন্ন বিবস্ত্র মানুষ অশ্রুসজল নেত্রে
পথে এসে দাঁড়িয়েছে।
তথাগত দেখছেন—চারিদিকের পৃথিবীটা হঠাৎই
তার কাছে অপরিচিত হয়ে উঠল
তাঁর স্নিগ্ধ প্রশান্ত মুখমণ্ডলে একে একে ঘৃণা, ক্ষোভ
অতঃপর দুঃখের অভিব্যক্তি
তথাগত'র ধ্যাননগ্ন রূপ বিঘ্নিত হল
লক্ষ কোটি মানুষের সাথে তাই তিনিও কাঁদলেন।

নিস্বন ঃ কলেজের সংস্কৃতির বাহক।

আশুতোষ কলেজ ছাত্র সংসদের সহায়তায় প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয়বর্ষের কলা বিভাগের ছাত্রছাত্রীরা বিগত দু'বছর ধরে প্রকাশ করছে ত্রৈমাসিক দেওয়াল পত্রিকা 'নিস্বন'। যা কলেজের সমস্ত ছাত্রছাত্রীদের নিজস্ব ভাবনার প্রতীক। নিস্বনের সম্পাদক মন্ডলী সকল ছাত্রছাত্রীদের কাছ থেকে তাদের লেখা কবিতা, গল্প, প্রবন্ধ প্রত্যাশা করছে। তোমরা এসো—নিস্বনকে গড়ে তোলো।

পঞ্চাশতম স্বাধীনতা

প্রদীপ কুমার শীল ঃ কলা বিভাগ, দ্বিতীয় বর্ষ

দুশো বছরের পরাধীনতা কে
পদদলিত করে,
স্বাধীনতার পতাকা উড়ছে
পঞ্চাশ সন ধরে।।
ব্রিটিশ রাজের অত্যাচার
এখন হয়েছে শেষ,
গড়ে উঠেছে সুন্দর করে
আমাদের এই দেশ।।
এখন আমরা সকলে গাই
বন্দেমাতরম্,
ভারতবাসী হয়ে ওঠে যেন
সত্যম্, শিবম্, সুন্দরম্।।
ত্রিবর্ণ এই পতাকা দেখে
যখন আমরা খুশি,
পেটে তখন ক্ষুধার ইদুর
ডাকে চি-চি, চি-চি।।
মাথা নাড়িয়ে যখন দেখি
রূঢ় বাস্তবটাকে,
স্বাধীনতার অর্থ তখন
হয় একে বারে ফিকে।।
সবাই যখন স্বাধীনতার
উৎসবেতে মত্ত,
গরীবের দেশ ভারতবর্ষ
এটাই তখন সত্য।।
বেকারী, দারিদ্র আর নিরাশাতে
ভরে গেছে সারা দেশ,
দেখে মনে হয় স্বাধীনতার
অর্থ হয়েছে শেষ।।
স্বাধীনতার নামে স্বৈরচারিতা
চলছে সারা দেশে,
আশাহত শিশু শ্রমিক
ভরে গেছে সারা দেশে।।
পরাধীনতার গ্লানি যখন
ভরে গেছে সারা দেশে,
পঞ্চাশতম স্বাধীনতার
পতাকা উড়ছে দেশে।।

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

● আশুতোষ কলেজের বিভিন্ন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ও বার্ষিক পত্রিকা প্রকাশে যে ছাত্র-ছাত্রীরা বিশেষভাবে সাহায্য করেছে—— মৌ রায়, পার্থ সাহা, অয়ন সরকার, সৈকত পাল, জয়ীতা গোস্বামী, প্রতীক দাস, সোমরাজ ঘোষ, প্রতিম বসু, মৌতি বসু, অনুরাধা গাঙ্গুলী, দেবনাল্য শীল।

● প্রতিটা সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানকে সুষ্ঠুভাবে সম্পাদন করতে নিরলস ভাবে সাহায্য করে গেছেন আশুতোষ হলের বিশিষ্ট কর্মী ও আমাদের প্রিয় স্বপন দা। এবং আশুতোষ কলেজের শ্রদ্ধেয় শিক্ষাকর্মীবৃন্দ।

এ বছর আশুতোষ কলেজে দুটি রক্তদান শিবির আয়োজিত হয়——

● আশুতোষ কলেজ ছাত্রসংসদের সম্পূর্ণ নিজস্ব উদ্যোগে দি থ্যালাসেমিয়া সোসাইটি অব ইন্ডিয়া কে রক্তদান।

● স্টুডেন্টস্ হেল্‌থ হোম্ এর উদ্যোগে ও আশুতোষ কলেজ ছাত্রসংসদের সহায়তায় রক্তদান।

বিহারের জেহানাবাদের গণহত্যা'য় আমরা গভীরভাবে মর্মাহত। রণবীর সেনা—কৃত এই নৃশংস ঘটনার বিরুদ্ধে তীব্র ধিক্কার জানাচ্ছি।।

অনাহুত

শুচিস্মিতা সরকার : রাশিবিজ্ঞান বিভাগ, দ্বিতীয় বর্ষ

সম্বন্ধ করেই বিয়ে হয়েছিল ওদের প্রবীর আর রমিতার। যেমন আমার, তোমার, রিনিদির, বুলাপিসীর হয়ে থাকে আর কি। নিতান্তই গল্পহীন, সাদামাটা, ম্যাড়মেড়ে বিয়ে। যা নিয়ে ছোটোগল্প কেন—একটা রসালো নুচনুচে আলোচনাও দানা পাকিয়ে উঠতে পারে না গিন্নীমহলের দুপুরের বৈঠকে। তবুরোমাঞ্চহীন রজনীগন্ধার মালা জড়ানো সেই ফুলশয্যার রাতেই সাধাসিধে তিরিশ বছরের প্রবীর, ব্যাঙ্কের ছাপোষা কেরানী- প্রবীর হঠাৎ এক ধাক্কাতে স্থান পেয়ে গেলো গল্পে। নায়ক। কি জানি। শেষ অঙ্কের যবনিকা পড়ার আগে কে হতে পারে নিঃসংশয় নায়ক। তবে ফুলশয্যার রাতে আরো পাঁচটা সাধারণ বাঙালী ছেলের মতো বাঁধা ফর্মুলায় নায়ক হওয়া তার ভাগ্যে জুটলো না।

জুটলো না কারণ রমিতার জীবনে এর আগেই চলে এসেছিল পলাশ। পলাশ। সদাচঞ্চল, হাসিখুশী পলাশ। পাগল পলাশ। রমিতার জন্য তিনভুবন তোলপাড় করে বকুল ফুল নিয়ে আসা পলাশ। বত্রিশ পাতার চিঠি লেখা পলাশ। রমিতার জীবনে বসন্ত যেন পলাশের মধ্য দিয়েই তার সবটুকু রক্তিমা, সবটুকু অনুরাগ নিয়ে বাদল দিনের প্রথম কদম ফুলের মতো তীব্র মাদকতায় তাকে আচ্ছন্ন করে রেখেছিল। রমিতার সাথে একই কলেজে রমিতার মতই ইতিহাসে অনার্স নিয়ে পড়তো পলাশ। কথা বলার সময় পুরু চশমার আড়াল থেকে চোখদুটো ঝলমল করে উঠতো। লম্বা ছিপছিপে দেহ আর সবল দুটি হাত টেবিল টেনিসে যতটা পটু ছিল, লেখনী ধারণে ততটা নয়। পার্ট ওয়ানে ফার্স্ট পার্সেন্টের পর রমিতা ওর চোখে চোখ রেখে বলেছিল, 'পারতেই হবে। আমার জন্য পারতেই হবে তোমাকে। ভিক্ষা নয়, আমাকে দাবী কর তুমি।' পলাশ পারে নি। রমিতার বাবার কাছে গিয়ে তাকে দাবী করার অধিকার লাভ করতে পারে নি সে। তাই দুবছর পর অঘ্রাণের সতেরোয় চন্দনচর্চিতা রমিতা যখন প্রবীরের সাথে সাতপাকের বন্ধনে জড়িয়ে যাচ্ছে সারা জীবনের মতো—তখন শহর থেকে অনেকদূরে পরিত্যক্ত নদীর ঘাটে বসে একটার পর একটা ঢিল ছুঁড়ে জলের বুকে প্রতিবিম্বিত পূর্ণিমার চাঁদটাকে চুরমার করে দিচ্ছিল পলাশ।

রমিতা ঠিক করেছিল স্বামীর কাছে কিছু লুকোবে না। যতটা না দাম্পত্য সততার দাবীতে, তার চেয়েও বেশী সে আশা করেছিল—সব কথা শোনার পর প্রবীর হয়তো তাকে অস্বীকার করবে, দুর্ব্যবহার করবে তার সাথে, ডির্ভোস করবে তাকে। যেভাবেই হোক না কেন, নিজের একটা চরমতম লাঞ্ছনা ঘটাতে চাইছিল রমিতা। সে সব কিছুই হল না। ফুলশয্যার রাতের প্রাথমিক জড়তা কেটে যাওয়ার পর অকপটে সব কথা খুলে বললসে। এক একটা সময় আসে মানুষ যখন নিজের অজান্তেই নিজেকে অতিক্রম করে যায়। নিত্য দোকানীর সাথে দরদাম করা, দশটা-পাঁচটার বাসের ভিড়ে পিষ্ট হওয়া হরিপদ কেরানীও হঠাৎ করে ঈশ্বরকে ছুঁয়ে ফেলে। প্রবীরও ঠিক সেইরকম শান্ত হয়ে শুনলো সব কথা—তার ত্রিশ বছরের জীবনের প্রথম নারীটিকে ঘিরে গড়ে ওঠা একমাস যাবত লালিত সকল স্বপ্ন বিবর্ণ হয়ে গেলো—তবু সে রাগ করতে পারলো না রমিতার ওপর। শুধু প্রসববেদনার প্রবল আনন্দ সহ্য করার পর সদ্যপ্রসূতি যদি জানতে পারে যে সে মৃতসন্তানের জন্ম দিয়েছে তাহলে বিলাপহীন বোবা কান্না দিয়ে সে যেভাবে ঈশ্বরকে অভিযোগ জানায়; ঠিক সেইরকম তীব্র অন্তর্দাহে পুড়তে পুড়তে প্রবীরের মনে হলো কি এমন প্রয়োজন ছিল তাকেই বলি দেওয়ার। সে তো খুব বেশী কিছু চায় নি। অফিস থেকে ফিরে একটা প্রতীক্ষারত টিপ পরা মুখ, একটু হাসি, সন্ধ্যার জলখাবারে একটু বাড়তি নৈপুণ্য, কোনোদিন দেরী হলে একটু উৎকণ্ঠা। ব্যস। সে তো গল্পের নায়ক হতে চায় নি। ছাপোষা কেরানী সে। আরো পাঁচজনের মতো ছাপোষা জীবনই ভোগ করতে চেয়েছিল। আচম্বিতে এসে পড়া এ অসাধারণত্বের দায় সে সামলায় কি করে। রমিতা তাকে ঠকাতে চায় নি। খুলে বলেছে সব কথা। এখন মনে হচ্ছে, না বললে কি এমন ক্ষতি হতো তার। নাহয় থাকতো রমিতার কোন গোপন কথা, না হয় একটু ঠকতোই প্রবীর, না হয় তার কল্পনার সেই মধুর দাম্পত্যপ্রেমের অনেকটাই হতো মেকি। তবু তো সত্যটা এমন নগ্ন হয়ে, বীভৎস ক্ষতবিক্ষত হয়ে তার পথ জুড়ে এসে দাঁড়াতো না। প্রবীর বুঝছে রমিতা নিজেকে অপরাধী

মনে করছে। কিন্তু তাতে প্রবীরের কি লাভ। এই মুহূর্তে সদ্যলব্ধ স্বামীত্বের অধিকার ফলিয়ে রমিতাকে নিষ্পেষিত করে শান্তি দিতে পারে সে। পরম রমনীয় ভাবে জাগতে পারতো যে অনুভূতি, অপ্রত্যাশিত ধাক্কা খেয়ে তা এখন নখ বার করে পশুর রূপ নিতে চাইছে। কিন্তু না। সভ্য, শিক্ষিত মানুষের অনেক জ্বালা। বিবাহিতা স্ত্রীর কাছেও। দেহের রন্ধ্রে রন্ধ্রে মিশে থাকা আদিম সংস্কার বলে 'বীরভোগ্যা বসুন্ধরা'। উপরের মার্জিত আবরণটা সাবধান করে দেয়—'ছিঃ। লোকে কি মনে করবে।' রমিতা কি মনে করবে।

খাটের কোণে ঠেস দিয়ে বসা ক্রন্দনশীলা রমিতার পিঠে হাত দিয়ে প্রবীর বললো, 'তোমার কষ্ট বুঝতে পারছি। কিন্তু আমাদের মনটা তো আমরা ইচ্ছে করলেই বাড়াতে পারি। পলাশের পাশাপাশি পারবে না আমার জন্য একটু জায়গা করে দিতে?'

রমিতা অবাক হয়ে চেয়ে রইলো।

তারপর অস্ফুটে বললো, 'হয়তো পারবো। সময় লাগবে।'

'বেশ তো। নিও সময়।'

সময় নিয়েছে রমিতা। হয়তো বা প্রয়োজনের তুলনায় কমই। প্রবীরের স্ত্রী হয়ে ওঠার চেষ্টা সে করেছে প্রাণপন। অফিস থেকে ফিরে প্রবীর রোজই দেখেছে সেই টিপপরা মুখ, হাসি, গরম জলখাবার—যেমনটা সে চেয়েছিল। কিন্তু প্রথম রাতের সেই স্মৃতি, টিপপরা মুখকে বিবর্ণ করে দিয়েছে, হাসি হয়ে উঠেছে ফিকে, গরম জলখাবার পানসে লেগেছে।

এইভাবে কেটেছে দিন। ঘুরেছে বছর। রমিতার এগিয়ে আসা পর্যন্ত প্রবীর অপেক্ষা করেছে। নিতান্ত জৈবিক নিয়মেই দুবছরের মাথায় এসেছে টুপুর—ওদের মেয়ে। এখন আর রমিতার হাসি অতটা ফিকে লাগে না। টুপুরকে নিয়ে মেতে উঠেছে রমিতা। টুপুরের অন্নপ্রাশনের নিমন্ত্রণের চিঠির বয়ান তৈরী করার প্রসঙ্গ উঠলো। প্রবীর বললো, 'ওসব ব্যাপার তুমিই করো। চিঠি-ফিঠি আমার দ্বারা আসে না।'

'এজন্যই তো কোন মেয়ের সাথে লাইন মারতে পারো নি।'

বহুবছরের পর হঠাৎ একটা ধাক্কা। টুপুরের আসা নিশ্চিত হবার পর ঐ প্রসঙ্গ ভুলে যেতেই বসেছিল ওরা। কাষ্ঠহাসি হেসে প্রবীর বললো, 'হ্যাঁ, এসব ব্যাপার তো তুমিই বোঝো ভালো।'

ওহ্! মুখ ফসকে একটা কথা। কেন, কেন ওকথা বলতে গেলো রমিতা। বেশ তো ছিলো ওরা দুজন ওদের নতুন স্বর্গ নিয়ে। আজ কেন মনে পড়ছে তাকে বত্রিশ পাতা জোড়া চিঠি লিখেছিলো পলাশ।

অন্নপ্রাশনের প্রসঙ্গ বরবাদ। যান্ত্রিকভাবে নিটে গেলো রাতের খাওয়া-দাওয়া। তারপর বাইরে বারান্দায় সিগারেটের ধোঁয়ার বৃত্তে একা প্রবীর আর ঘরে নীল মশারির তলায় টুপুরের পাশে রমিতার চোখ ঝাপসা। অনেক রাতে প্রবীর এসে রমিতার মাথায় হাত দিলো—'আমায় ক্ষমা করে দাও। ওভাবে বলা অন্যায় হয়েছে আমার।'

রমিতা ভেঙে পড়লো—'আর কখনো আমায় অমন করে কষ্ট দিও না তুমি।'

কে কাকে কষ্ট দেয়। প্রবীর রমিতাকে কষ্ট দেয়, রমিতা পলাশকে কষ্ট দেয়, পলাশ রমিতাকে। একা প্রবীর সর্বংসহ।

এর আট বছর পর ওদের দ্বিতীয় সন্তান বাবলু যখন রমিতার গর্ভে, ট্রেন অ্যাক্সিডেন্টে মারা গেল পলাশ। এখবরটাও আনলো প্রবীরই। রমিতা আছড়ে পড়েছে মেঝের ওপর। সেদিনই মেয়ের বাড়ীতে হঠাৎ রমিতার মা-বাবা। কি পরিহাস। ভূতপূর্ব প্রেমিকের মৃত্যু সংবাদ পেয়ে তাঁদের মেয়ে অজ্ঞান হয়ে পড়েছে; আর তাঁদেরই কাছ থেকে আসল সংবাদ গোপন রেখে ডাক্তার আনতে ছুটছে প্রবীর।

বাবলু এল। রমিতা আবার মেতে উঠল নতুন পুতুলটাকে নিয়ে। টুপুর বেড়ে উঠছে তরতর করে। কি মিষ্টি ঘাড় বাঁকিয়ে কবিতা বলে মেয়েটা। মাথায় লাল রিবন লাগিয়ে যখন স্কুলে যায়, দেখায় পরীর মতো। আর বাবলু। সে যা দুরন্ত হয়েছে। সারাদিন ঘুমিয়ে চেঁচাবে সারা রাত। নতুন খেলনাগুলো দুদিন যেতে না যেতে ভেঙে ফেলা তার একটা শখ। আর সর্বত্র নতুন ওঠা দাঁতের জোর পরীক্ষা করে বেড়াচ্ছে।

সেই পরীর মতো মেয়েটা আর দুরন্ত ছেলেটা আস্তে আস্তে বেড়ে উঠলো। কি আশ্চর্য লাগে প্রবীরের। এখন রমিতার শরীরে শুধুই সংসারের গন্ধ। রমিতার হাসি এখন আর ফিকে লাগে না, তবে শুধু তারই জন্য তো আর হাসে না রমিতা। রমিতা এখন হাসে, উচ্চস্বরেই হাসে তার ছেলেমেয়ের কথায়—টুপুরের বলা কোনো জোক্স্ শুনে

অথবা বাবলুর কাণ্ডকারখানায়। শুধু তারই জন্য কোনোদিনই হাসলো না রমিতা।

'এই যে, খাবে এসো।'

রমিতার ডাকে চমক ভাঙলো। টুপুর হোস্টেলে, বাবলুর স্কুল। কদিন ধরেই শরীরটায় জুত নেই। তাই আজ অফিস যায়নি প্রবীর। রমিতাও বারণ করেছিল। এতক্ষণ কাগজটা নিয়ে বসে কি সব আজে বাজে ভাবছিল। একটা বেজে গেছে খেয়ালই নেই। খেতে যাওয়া যাক। খাওয়ার টেবিলে বসেই অবাক।

'কি ব্যাপার। আজ হঠাৎ এত কিছু?'

'মনে আর থাকবে কি করে। কোনোদিন তো এইদিনটাতে বউকে কিছু দাও নি।' প্রবীরের খুব কাছে এগিয়ে এসে জীবনে এই প্রথম শুধু তারই জন্য হেসে রমিতা বলল, 'আজ আমাদের বিয়ের পঁচিশ বছর পূর্ণ হলো যে।' পঁচিশ বছর। রমিতা, পঁচিশ বছর পরে আজ তুমি শুধু প্রবীরের জন্য প্রথম হেসেছো। কিন্তু কই। প্রবীরের মনে তো এখন আর নতুন কোন ঢেউ উঠছে না। পঁচিশ বছর ধরে যার জন্য অপেক্ষা করেছে সে, আজ তো তাকে অপ্রত্যাশিত ভাবে পেয়ে বুকে জড়িয়ে ধরছে না। এই তো রমিতার কথা শুনে পঁচিশ বছরের অভ্যস্ত দাম্পত্যের উপযুক্ত একটা রসিকতা করে পটল ভাজায় কামড় বসিয়েছে। মাংসের বাটিটার দিকে তাকিয়ে অন্যমনস্কভাবে প্রথম মনে হলো মাসের শেষে অনেকটা খরচ হয়ে গেলো।

নিঃশব্দের প্রেম

সুচরিতা দে ; রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ, তৃতীয় বর্ষ

অনেক দিন পর আবার ইচ্ছা হল বই পাড়ায় যেতে,যদিও ইচ্ছাটা আকস্মিক নয় ছেলের একটা বই কেনার দরকার হল, মেট্রোস্টেশন থেকে কিছু দূর গিয়েই আমাদের সেই দোকানগুলো, যেখানে অনেক চেনা পরিচিত মুখ। অনেক নতুন মুখও দেখছি, বইগুলো বেশ উল্টে পাল্টে দেখছি হঠাৎ আমার সামনে ভূতের মত সটান এসে দাড়ালেন এক ভদ্রলোক ; বেশ লম্বা, স্বাস্থ্যবান, চুলগুলো ছোট ছোট করে ছাঁটা, মোটা গোঁফের আড়ালে এতক্ষণ হাসিটাই লুকিয়েছিল, চোখের দৃষ্টির সম্মুখিন হতেই, আরে এতো আমাদের সবজু। গলাটা বেশ জোরেই সায় দিল কিন্তু মনে মনে বললাম, "এতো বৃষ্টির সবুজ।" সবুজ আমায় দেখে বলল, আপনি রঞ্জনা সান্যাল? ঠিক ধরেছি? কিন্তু বেশী মোটা হয়েছিস। তা যুটবল টিমটা কোথায়? লজ্জায় লাল হয়ে গেছিলাম, বললাম চল কফি হাউসে বসে কফিতে চুমুক দেবো আর পুরোনো মেজাজে গল্প করব। যথারীতি আমাদের পুরোনো জায়গায় বসে আমরা কথা বললাম, তার মধ্যেই জিজ্ঞাসা করলাম "হ্যাঁরে মধুমিতা কেমন আছে?" মধুর নাম শুনেই সবুজের মুখটা কালো হয়ে গেলো, নানা কায়দায় প্রসঙ্গটা বদলানোর ব্যার্থ চেষ্টা চালাল কিন্তু চাপ দিতেই বলল ওরা সুখী নয়, মধুর জন্য সবুজের "মা" আজ বৃদ্ধাশ্রমে। অথচ এই মধুই সবুজকে পাওয়ার জন্য নানা মিথ্যে আশা দিয়েছিল। আমরা জানতাম মধু সবুজকে চায়, শুধু নিজের জন্য। কিছুক্ষণ নিঃশব্দে কাটল। ওর দিকে তাকাতেই ও বলল, হ্যাঁরে আমাদের অন্য বন্ধুদের খবর কিছু জানিস? কয়েকজনতো রীতিমত প্রতিষ্ঠিত। আর বৃষ্টি? বৃষ্টি সরকার। ওতো তোর বেস্ট ফ্রেন্ড... আমি সঙ্গে সঙ্গে বললাম, "ও বালিগঞ্জে-এ থাকে।" সবুজ কোথায় হারিয়ে গিয়েছিল, তবু বলল বৃষ্টিটা যদি আমায় ভালোবাসতো। ওকেই—বলে কেমন যেন হয়ে গেল। ওর চোখে রামধনুর সাতটা রঙ দেখতে পেলাম, পরক্ষণেই নীল হয়ে গেল। ঠিক বুঝলামনা ওর দৃষ্টির ভাষা। কিছুক্ষণ চুপ করে ছিলাম, কারণ 'ট্রে' হাতে ওয়েটার এগিয়ে এলো টেবিলে, স্যান্ডউইচ আর কফির কাপগুলো টক্ টক্ শব্দে নামালো। কাপের কফি থেকে গরম বাষ্প বেরোচ্ছে, আমি ওর দিকে তাকিয়ে আর স্থির থাকতে পারলাম না, বললাম সবুজ তুই জানতেই পারলি না। সবুজ অস্থির হয়ে বলল কি জানতে পারলাম না। অজান্তেই আমার মুখ দিয়ে বেরিয়ে এল তোকে... তোকে বৃষ্টি ভালোবাসতো তো।' বহু প্রতিশ্রুতি ভেঙে বলেই দিলাম। সবুজ শুনে পাগলের মত বলল, সত্যি? এটা কি সত্যি? বৃষ্টি আমায়...আমায় কোন দিন বলেনি কেন? কেন আমার প্রাপ্য থেকে বঞ্চিত করল। কেন আমার জীবনটাকে নরক করে তুলল।
আমি ওকে বোঝাতে চেষ্টা করলাম তুই ভুল বুঝছিস। কিন্তু ও তোদের সুখের কথা ভেবেই (কথাটা শেষ হল না) রেগে লাল হয়ে বলল, "সুখের কথা ভেবেই, ওঃ তাইত।"
আমারতো এখন অনেক সুখ। বলতে বলতে চোখ দুটো জলেভরে এলো কিন্তু নিজের পৌরুষত্বক লাঞ্ছিত যাতে না হতে হয় তাই কায়দা করে চোখ বুজে লম্বা একটা সিগারেটের টান মারল। ধোয়াটা ছেড়ে আবার বলল তা আমার

সুখের জন্য যে এতো কিছু করল, সে কেমন আছে?
ও বেশ ভালই আছে ওর একটা ছেলে আছে সে মুসৌরিতে পড়াশোনা করে, আর বৃষ্টি ওর বরের চাকরিটা করে ব্যাঙ্কে-এ।
সবজু ভ্রু কুচকে বলল বরের চাকরি মানে? ওর স্বামী কি এখন আর চাকরি করেনা?
—না মানে...
—মানেটা স্পষ্ট করে বল রঞ্জনা,
টেবিলের দিকে চোখ নামিয়ে বলেই ফেললাম ওর স্বামী গত বছর কার এ্যাক্সিডেন্টে... নিলাদ্রীদা আর নেই।
—কি বলছিস তুই? ও তাহলে খুব একা এখন? আমি বললাম, না তেমন কিছুই নয় ওর শ্বশুর শাশুরিকে নিয়েই থাকে। আসলে ওর শ্বশুর শাশুরি ওকে পেয়ে নিলাদ্রীর শোক কিছুটা ভুলেছে। যদিও বৃষ্টি স্বামী ছাড়া কিছুটা তো মানসিক ভাবে একাই হয়ে গেছে।
সবুজ হঠাৎ করে বলল আর আমার কপাল দেখ মা ছাড়া বাড়িতে কেউ নেই তবু মধু তাকে নিয়ে থাকতে পারল না আমার জীবিত অবস্থাতেই।
যদিও জানি প্রশ্নটা করার কোন মানে হয় না তবু একটু কৌতূহল হচ্ছে তাই জিজ্ঞাসা করছি, "বৃষ্টি আমায় কিছু বলেনি কেন? কেন সেদিন ও স্বীকার করেনি যে আমায় ও ভালোবাসে..."
আমি ওর কৌতূহলী চোখ দুটোকে এড়াতে পারলাম না। বললাম আসলে বৃষ্টি জানত যে মধু তোকে ভালোবাসে আর তুইতো জানিস বৃষ্টি কেমন চাপা নেয়ে ছিল। আঙুল কেটে রক্ত বেরোচ্ছিল তবু ফাংশন করেছিল।
সবুজের চোখে আবার সাতটা রঙ "সেদিনের কথা আজো ভুলিনিরে।"
আমি বললাম আসলে ও মধুকে ভালোবাসতো আমি বকাতে আমায় বলেছিল 'আমি হ্যাঁ করলে তো মধুর কষ্ট হবে।'
সবুজ গম্ভীর হয়ে বলেছিল— আর বৃষ্টি, বৃষ্টির কষ্ট হয়নি?
আমি মাথা দুদিকে নেড়ে বললাম— জানি না তুই ওকেই জিজ্ঞাসা করবি।
হতাশ হয়ে সবুজ বলেছিল "আমার সাথে তো ওর দেখা নেই অনেকদিন। তাছাড়া সামনে গেলে যদি রাগ করে?"
আমি সান্ত্বনা দিয়ে বললাম, "আরে নানা রাগবে কেন? বরং খুশিই হবে। আমি তোকে ঠিকানাটা দিচ্ছি।" ব্যাগ থেকে একটা ছোট্ট চিরকুট সবুজের হাতে ধরালাম।
সবুজ চিরকুটটা পকেটে রেখে বিলটা দিয়ে দিল। তখন বেশ সন্ধে হয়ে গেছে দুজনেই বেরিয়ে এলাম তারপর আমায় মেট্রোপর্যন্ত এগিয়ে দিয়ে সবুজ চলে গেল।

(২)

ভোর বেলটা বেজে উঠতেই বৃষ্টি দরজাটা খুলল। খুলেই অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকল। বলল, "সবুজ, আমি ঠিক চিনেছি?"
সবুজ তখন তার বৃষ্টিকে দেখছিল। একদম বদলায়নি খালি মুখটা ফ্যাকাশে হয়ে গেছে। আর মুখে সামান্য ক্লান্তির ছাপ।
সবুজ বলল—ঘরে আসতে বলবিনা?
বৃষ্টি তঠস্থ হয়ে ওকে ঘরে আসতে বলল, কি খাবি বল? ঠান্ডা সরবৎ?
—এখন সেটাই ভালো, বাইরে যা গরম।
বৃষ্টি ভিতরে গিয়ে সরবৎ, ফল নিয়ে মিনিটের মধ্যে ফিরে এলো। ততক্ষনে ঘরের সব গোছানো জিনিস সবুজের দেখা হয়ে গেছে।
—বাঃ তুইকি জানতিস আমি আসব? সব একেবারে তৈরি ছিল মনে হচ্ছে?
—তৈরি ছিল, তবে তুই আসবি জানতাম না।
—জানলে দরজাই খুলতিসনা তাই তো?
—ওমা তা কেন করতাম। আসলে আমার ছেলের আসার কথা তাই সব তৈরী করেছিলাম।
—তাহলে ছেলের ভাগে ভাগ বসালাম?
—আরে না না। আচ্ছা তুই আমার ঠিকানা কার কাছে পেলি?

—নাই বা জানলি?
বৃষ্টি বলল— রঞ্জনা দিয়েছে?
— ঠিকই ধরেছিস
—ওকি তোকে কিছু বলেছে?
—কিছুটা বলেছে। তবে... বৃষ্টি তুই জিজ্ঞাসা করলিনা আমি কেমন আছি?
—কেন বেশ ভালই তো দেখছি, মধু কেমন আছে?
—যেমন চেয়েছিলি ঠিক তেমন আছে (উত্তরটা কেমন যেন লাগল বৃষ্টির)
বৃষ্টি আবার বলল— মাসীমা কেমন আছে?
—সরবৎটা শেষ করে বলল, জানিনা।
— জানিস না মানে?
—মা আমার কাছে থাকে না, বৃদ্ধাশ্রমে থাকে আর বহুদিন হল যাওয়া হয়নি। তাও তোমার মধুর সুখের জন্য।
—কি বলছিস। মাসীমা থাকেনা তোদের সাথে। মধু এরকম করতে পারে বলে ভাবতেই পারছি না।
—তুই অনেক কিছুই বুঝিসনি বৃষ্টি। কাউকে সুখ দেবার জন্যে আমায় দুঃখ দিয়েছিস।
— নিজের সুখ নিজেকেই খুঁজতে হয়। তুই যা খুজছিস বাইরে, দেখ সেটা তোর ঘরেই আছে।
— তোকে আজ আবার সেই পুরোনো প্রশ্নটা করি...
হঠাৎ তোর বেলটা 'কেচ্, কেচ্' করে বেজে উঠল। অনিকেত। বৃষ্টির ছেলে। বৃষ্টি বলে ওঠে— "ঘরে আয় দেখ, তোর সবুজ মামা এসেছে। তোকে যার কথা বলেছিলাম।"
সবুজ অবাক হয়ে অনির দিকে তাকিয়ে ছিল, অনিই এগিয়ে এসে আলাপ করল, বলল— "আপনার কথা মায়ের মুখে শুনেছি।"
সবুজ বৃষ্টির দিকে করুণ ভাবে চেয়ে বলল — আজ আসিরে, আগামী কাল আমার ট্রান্সফার অর্ডার দেবে, আমি তারপর বাঙ্গালোর চলে যাবো।
বৃষ্টি স্থির দৃষ্টিতে সবুজের দিকে তাকিয়ে থাকল। সবুজ উঠে দরজা দিয়ে বেরোতে যাচ্ছিল, বৃষ্টি বলল কি যেন জানতে এসেছিলি?"
সবুজের ঠোঁটের কোণে একচিলতে হাসি বলল, জানা হয়ে গেছে। মনে মনে বলল — যা আজ থেকে কুড়ি বছর আগেই জানা উচিৎ ছিল সেই নিঃশব্দের প্রেমকে আজ বুঝলাম। খুব দেরি করে ফেলেছিরে বৃষ্টি।
বৃষ্টি দেখল সবুজ গলি দিয়ে বেরিয়ে বড় রাস্তায় জনারণ্যে হারিয়ে গেল। আর তার প্রেম আজও নিঃশব্দই থেকে গেল।

সেই দিনের শেষ দেখা

সুভাশিষ কুমার দে : দ্বাদশ শ্রেণী, বিজ্ঞান বিভাগ

বাড়িতে ফিরে শুনলাম চন্দ্রা মারা গেছে। প্রথমে আমি কিছুতেই বিশ্বাস করতে পারিনি। কিন্তু পরে মনে হল এটাইতো ছিল তার শান্তি পাওয়ার একমাত্র রাস্তা। মেয়েটি কে? সে কি আমার সাথী? না অন্য কোন সম্পর্ক ছিল তার সঙ্গে ? সম্ভবত এই সকল প্রশ্ন সবার মাথায় ঘুরপাক খায়। কিন্তু অনেক চেষ্টা করেও আমি বার করতে পারিনি, তার সঙ্গে আমার প্রকৃত সম্পর্কটা কি? সে আমার বন্ধু ছিল, না তাছাড়া অন্য কিছু সম্পর্ক ছিল তার সঙ্গে। বয়সে আমার চেয়ে প্রায় এক বছরের বড় ছিল, কিন্তু তার হাব ভাব কথা বার্তায় আমাকে কোনদিন বয়সের সীমা বুঝতে দেয়নি সে। মেয়েটির নাম ছিল চন্দ্রিকা। চন্দ্রিকা সেন। তার চোখের স্নিগ্ধতার মধ্যেও তার উচ্ছলতা সবাইকে আকর্ষণ করত। শুধু তাই নয় আলাপীও ছিল বটে। মন ছিল কাঁচের মত স্বচ্ছ। পাড়ায় থাকে বলে অনেক ছোট থেকেই তাকে চিনি, শুধু তাই নয় গল্প, খাওয়া, বসা, ওঠা প্রায় সবই ছিল তার সঙ্গে। সে ছিল বাবার খুব আদুরে মেয়ে। কোন কিছু চাওয়ার আগেই তার কাছে সেটা এসে হাজির হয়ে যেত। আলাপী হওয়ায় তার বন্ধুর সংখ্যাও কম ছিল না। তার শেষ জন্মদিনের অনুষ্ঠানে শুধু তারই পঞ্চাশ জন বন্ধু বাড়িতে নিমন্ত্রিত হয়েছিল। সব কিছু মিলিয়ে মেয়েটিকে আমার ভালো লেগে গিয়েছিল। কিন্তু তার ষোল বছর বয়সের পর থেকে তার জীবনের গতিটার মন্দন শুরু হয়ে যায়। এখানে একটা কথা বলে রাখা প্রয়োজন তার সাথে আমার আলাপ হয় এক সামান্য ঝগড়া নিয়ে। তবে এটা ঠিক যে আমি তাকে কোন দিন আমার ভালোবাসার কথা জানাতে পারিনি। কথায় আছে, মানুষের জীবন কখনই

সমান্তরাল ভাবে চলে না। এই কথাটা ধ্রুব সত্য। কয়েকমাস পরে তার বাবা গাড়ি অ্যাক্সিডেন্টে মারা যায়। আমরা গিয়ে তাকে বিভিন্ন সান্ত্বনা দিলেও সে এই ঘটনাটাকে মেনে নিতে পারে না, তার ফলে তার জীবনে একটা পরিবর্তন নেমে আসে। আগের মত এখন তার আর সেই প্রাণ— উজ্জ্বল ভাব নেই; মজা করে কথা বলার ক্ষমতাটাও হারিয়ে ফেলেছে। তার মা কয়েক মাসের মধ্যে বাবার চাকরিটা পেয়ে যায়। কিন্তু তার মা স্বামী শোক ভুলে গিয়ে অন্য নেশায় মেতে ওঠে। এটা শুধু আমি না, চন্দ্রাও এই মন্তব্য করেছে। তাই সে আমার কাছে একদিন মত প্রকাশ করে— "আমি এখানে থাকবনা, চলে যাব যেখানে দুচোখ চাইবে।" অল্প দিনের মধ্যে আমাদের সাথে তার মেলামেশা বন্ধ করে দেয়। ইতি মধ্যে চারটি বছর অতিবাহিত হয়ে গেছে। একদিন বাড়িতে ফিরে দেখি টেবিলের উপর চন্দ্রার বিয়ের নিমন্ত্রণ পত্র। রীতিমত চমকে গেলাম। বোনের কাছে শুনলাম সে আমার সাথে একান্তে দেখা করতে চায়। সুযোগ বুঝে একদিন তার বাড়িতে গিয়ে হাজির হলাম। সে আমার হাত ধরে কাঁদতে কাঁদতে বলল— "তুই আমাকে বাঁচা, মা আমাকে বিক্রি করে দিতে চায়, তুই এখান থেকে আমাকে নিয়ে চল।" আমি তাকে বোঝালাম, তোর মা তোর কোনদিন খারাপ চাইবে না, তোকে উপযুক্ত পাত্রের হাতেই তুলে দেবে। সে বলল, "আমি অত কিছু জানি না এইনে টাকা, তুই আমাকে পালানোর ব্যবস্থা করে দে"। আমি নিজেকে নেয়ে ভাগানোর অপরাধে জড়াতে পারলাম না তাই আমি ওকে বোঝালাম, "এটা ঠিক হবে না, তুই ভুল করছিস, কাকিনা তোর কোন দিন খারাপ চাইবে না।" সে কিছুক্ষণ আমার হাত ধরে কাঁদল আর কিছু বলল না। বিয়ের দিন বরটিকে দেখে মনে হল খুবই বড় লোকের ছেলে, দেখতে খারাপ না। আচার আচরণ খুবই ভদ্র ও কথাবার্তা খুবই সংযত। তখন তাই আমার মনে হয়েছিল। চন্দ্রাকে আমি ঠিক উপদেশ দিয়েছি। কিন্তু আজ মনে হচ্ছে আমার চেয়ে তার লোককে চেনার ক্ষমতা ছিল অনেক গুণ বেশী। বিয়ের পরে তার সাথে দেখা হয়নি বহু বছর, মনেও পড়েনি তার কথা, বলা যায় ইচ্ছে করেই তাকে মনে আনতে চাইনি। কিন্তু বহু বছর পর তাকে এক নামী হোটেলে এক ভদ্রলোকের সাথে দেখতে পাই। ভদ্রলোক চলে গেলে তার দৃষ্টি পড়ে আমার উপরে। সে কাছে এসে বলল "কিরে, কেমন আছিস? চিনতে পারছিস তো?" তার মুখে সেই উজ্জ্বল ভাব নেই। সেই মিষ্টি হাসি নেই অনেক দুঃখ চেপে খুব কষ্ট করে হাসছে। আমি বললাম, "পারবনা কেন? তোকে কি কোনদিন ভুলতে পারি"। "তবে বেঁচে আছি কিনা খোঁজ নিসনি কেন?" কোন তৈরী উত্তর না থাকায় বললাম "সময় পাইনি" সে বলল, "চল বাইরে কোথাও গিয়ে বসি, অবশ্য তোর যদি কোন কাজ না থাকে" সে আমার একের পর এক খবর নিতে থাকল। আমি তার খুঁটিনাটি প্রশ্নের ভেঙে ভেঙে উত্তর দিতে থাকলাম। শেষ হতে আমি তাকে প্রশ্ন করলাম "তুই কেমন আছিস? সে কিছুক্ষণ থেমে বলল "ভালো—, বলতে পারিস" আমি বললাম সে কেমন আছে। বলল, "জানিনা।" আমি বললাম "অন্য কোথাও থাকে বুঝি।" ও আর একটা কথা না বলে কিছুক্ষণ চুপ করে রইল তারপর দুই চোখ ভরা জল নিয়ে আমার দিকে তাকিয়ে বলল "আমাকে তুই একটু বিষ জোগাড় করে দিতে পারবি?" বললাম "কি সব উল্টো পাল্টা বলছিস বলতো, তোর কি হয়েছে তুই আমাকে খুলে বল" সে বলল "পরে একদিন সব বলব" বলে সে ওখান থেকে চলে গেল। সে পরে দিনটা কবে আসবে তা কে জানে। বাবার মৃত্যুর পরে তাকে দেখে আমার মনে হয়েছিল সে খুব বিপদের মধ্যে আছে। তাই সে বারবার বলেছে, বাড়ি ছেড়ে পালাব, কখন বলছে আমাকে বাড়ি থেকে পালিয়ে নিয়ে চল। কখন আবার বলছে বিষ জোগাড় করে দে। তাই শেষ পর্যন্ত সে বিষ জোগাড় করতে না পেরে গায়ে আগুন দিয়েছে। তার মৃত্যুর যে সমস্ত কারণ আমি শুনেছি তাতে আমার মনে হয়েছে এর জন্য আমি দায়ী, তাকে যদি সেদিন পালানোর সুযোগ করে দিতাম তবে তার জীবনের এই চরম পরিণতি কখনই ঘটত না। তার স্বামী ছিল এক নম্বরের লম্পট। সে বহু নারী শয্যায় অভ্যস্ত, সে চন্দ্রিকাকে ব্যবহার করেছিল উন্নতির পথে ওঠার সিঁড়ি হিসাবে। সেই দিন হোটেলে সেই অপরিচিত লোকটি ছিল তার স্বামীর বিজনেস পার্টনার। শুধু তাই নয় বাড়িতে শ্বশুর শাশুড়ির অত্যাচারও সহ্য করতে হয়েছিল। এর সাথে সহ্য করতে হয়েছিল দেওয়রের অত্যাচার ও ননদের মুখ। তাকে বিভিন্নভাবে ব্যবহার করেছিল বাড়ির সকল লোকেরা। সে কোনদিন এক মুহূর্তের জন্য স্বামীর স্বার্থহীন ভালোবাসা পায়নি। তার বদলে পেয়েছে তিরস্কার, গালাগালি, নির্যাতন ইত্যাদি ইত্যাদি। মায়ের কাছে সে থাকার জন্য গেলে তার মা তাকে আশ্রয় দেয়নি। তার মা এখন নতুন স্বামীর নতুন ছেলে নিয়ে ঘর করছে। আর ছেলে বড় হচ্ছে তাই সে পুরান মেয়ের খরচ বইতে পারবে না। সে এই সমস্ত অত্যাচার সহ্য করে বেশ কয়েক বছর ছিল। তারপর সে আর সহ্য করতে না পেরে গায়ে তেল ঢেলে পুড়ে আত্মহত্যা করে। তার কাছে সংসারের জ্বালার তুলনায় আগুনে পোড়ার জ্বালা অনেক কম বলে মনে হয়েছিল। তার মত মেয়েরা কি তার স্বামীর মত ছেলেদের জন্য অকালে প্রাণ দেবে? চন্দ্রা পৃথিবী থেকে চলে গেছে বিবাহ, কিন্তু সেও আজও আমার মনে বেঁচে আছে সেই চঞ্চলা তরুণী হিসাবে এবং সারা জীবন সে বেঁচে থাকবে।

তারাশঙ্কর ঃ অন্য চোখে

অধ্যাপক তপনকুমার বিশ্বাস ঃ বাংলা বিভাগ

বিচিত্র অভিজ্ঞতা পুষ্ট, আঞ্চলিক সংস্কৃতির রূপকার তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, শরৎ-পরবর্তী বাংলা কথা সাহিত্যের অন্যতম ব্যক্তিত্ব। 'চৈতালী ঘুর্ণি'র মতো সমসাময়িককালও ছিল সামাজিক—অর্থনৈতিক ঘূর্ণাবর্তের কাল। ক্ষয়িষ্ণু সামন্ততন্ত্র এবং গড়ে-ওঠা ধনতন্ত্রের ঘাত-প্রতিঘাতে তাঁর শিল্পীসত্তা ক্ষত-বিক্ষত। তিনি নতুন কালকে গ্রহণ করতে রাজী, কিন্তু পুরাতন ঐতিহ্যকেও কালাপাহাড়ের ভাঙা প্রতিমার মত বিসর্জন দিতেও পারেন না। তাছাড়া নতুন কালের প্রতি তাঁর আত্মিক সমর্থনও ছিল না—'ধাত্রী দেবতা' প্রভৃতি অমর সৃষ্টিতে রয়েছে তার জীবন্ত প্রমাণ। বনোয়ারির সঙ্গে করালীর যে সংঘাত, তা ঐতিহ্যের সঙ্গে প্রগতির, কৃষির সঙ্গে শিল্পের, সামন্ততন্ত্রের সঙ্গে ধনতন্ত্রের সংঘাত। আর বলা বাহুল্য যে, করালীকে তিনি প্রগতিশীল করে থাকেন, ঠিকই, কিন্তু তাঁর পূর্ণ সমর্থন থাকে বনোয়ারির প্রতি।'আমার কালের কথা', 'আমার সাহিত্য জীবন' প্রভৃতি আত্মজীবনী মূলক প্রবন্ধ সাহিত্যে তিনি ব্যক্তি জীবন ও শিল্পী জীবনের বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। তাই শিল্পীকে পরিপূর্ণভাবে বোঝার উদ্দেশ্যে আমরা প্রথমে তার প্রবন্ধ সাহিত্যের পরিচয় নিতে পারি ঃ

১। 'আমার কালের কথা'। আত্মজীবনী। জৈষ্ঠ ১৩৫৮

২। 'আমার সাহিত্য জীবন'। আত্মজীবনী। শ্রাবণ ১৩৬০

৩। 'কৈশোর স্মৃতি'। আত্মজীবনী। শ্রাবণ ১৩৬৩

৪। 'আমার সাহিত্য জীবন'। (২ য় পর্ব)। অগ্রহায়ণ ১৩৬৯

৫। 'সাহিত্যের সত্য'। প্রবন্ধ সঙ্কলন। অগ্রহায়ণ ১৩৬৭

সূচী ঃ 'লেখকের কথা', 'বাঙ্গালার সংস্কৃতি ও সমস্যা, আমার জীবনে কপালকুণ্ডলা', 'বাঙ্গালা সাহিত্যের, মর্মবাণী,' 'সমাজ ও সাহিত্য,' 'আধুনিককাল ও সাহিত্য,' 'আমি যদি আমার সমালোচক হতাম', যে বই লিখতে চাই', 'বঙ্কিমের মাতৃপূজা', 'সাহিত্যের সত্য', 'আধুনিক বাঙ্গালা নাট্য সাহিত্য', 'কবির কথা', 'মনে রাখার মত', 'শরৎচন্দ্র', 'আধুনিক সাহিত্য ও সমাজ', 'চীন ভ্রমণ', 'আধুনিক চীনের নারী'।

৬। 'বিচিত্র'। নিবন্ধ। চৈত্র ১৩৫৯

৭। 'ভারতবর্ষ ও চীন'। প্রবন্ধ। শ্রাবণ ১৩৭০

৮। 'রবীন্দ্রনাথ ও বাংলার পল্লী'। প্রবন্ধ সঙ্কলন।

[১৯৭১ সালের ১৪ই, ১৫ই, ১৬ই ও ১৮ই ফেব্রুয়ারী বিশ্বভারতীতে 'নৃপেন স্মৃতি বক্তৃতা'র দ্বিতীয় বর্ষে রবীন্দ্রনাথ ও বাংলার পল্লী' বিষয়ে চারটি বক্তৃতা। শেষ প্রবন্ধটি রবীন্দ্র শতবার্ষিকী বর্ষে রচিত ও প্রকাশিত। 'প্রারম্ভিক নিবেদন', 'রবীন্দ্রনাথ ও পল্লীর মানুষ,' 'রবীন্দ্রনাথ ও পল্লীসমাজ,' রবীন্দ্রনাথ ও পল্লীপ্রকৃতি' ও 'রবীন্দ্রনাথ ও ভারত ধর্ম'—পাঁচটি প্রবন্ধের সঙ্কলন।]

৯। বিবিধ ঃ চিঠিপত্র—ভাষণ প্রভৃতি। [যেগুলি সঙ্কলিত হয়নি]

তারাশঙ্করের শিল্পীমানস গঠনে তাঁর মা, মাটি, গ্রামীন সংস্কৃতি, আর্থ-সামাজিক রূপান্তরের দোলা ছাপ ফেলেছে সব থেকে বেশি। 'আমার কালের কথায়' তিনি সেকথা বলেছেন ঃ

১। "কাল পরিবর্তনের ক্ষণে আমার মা আমাদের বাড়িতে পদার্পন করে প্রসন্না শক্তির মতো কাজ করেছেন। শুধু রুচির দিক থেকেই নয়। ভাবের দিক থেকেও তাঁর মধ্যে তিনি এনেছিলেন নূতন কালকে।"

২। "লাভপুর গ্রামখানি অদ্ভুত।...কালের লীলা, কালান্তরের রূপমহিমা এখানে এত সুস্পষ্ট যে বিস্ময় না মেনে পারি না।...১৮৯৮ সালে লাভপুরের সমাজে তখন দুই বিরোধী শক্তির দ্বন্দ্ব চলছে। জমিদার-প্রধান গ্রাম।...লাভপুর সমাজের নেতৃত্বের আসন নিয়ে এই বিচিত্র বিরোধ সমাজ-জীবনের নানা স্তরে বিস্তৃত হয়েছে। কীর্তির প্রতিযোগিতা চলছে মহাসমারোহে প্রকাশের মধ্যে, দ্বন্দ্ব চলছে—সৌজন্য প্রকাশ নিয়ে। প্রতিদ্বন্দ্বিতা চলছে রাজভক্তি নিয়ে,

প্রতিযোগিতা চলছে জ্ঞানমার্গের অধিকার নিয়ে, আবার পরস্পরের মধ্যে কলঙ্ককালি ছিটানো নিয়েও চলছে জমিদার ব্যবসায়ীর মধ্যে বিচিত্র বিরোধ।"—এই বিরোধেরই জীবন্ত ছবি ফুটে উঠেছে 'কালিন্দী', 'পঞ্চগ্রাম', 'ধাত্রীদেবতা' প্রভৃতি উপন্যাসে।

তারাশঙ্কর কোন দৃষ্টিভঙ্গীর আলোকে সাহিত্যসৃষ্টি করেছেন, তারও পরিচয় মেলে প্রবন্ধ সাহিত্যে। এক ভাষণে তিনি বলেছিলেন : "আমার নিজের সাহিত্যের মধ্যে আমি যা বলেছি, তা সুস্পষ্টভাবে সেকালের সাহিত্যের বক্তব্য থেকে পৃথক। তাঁরা দৃষ্টির যে কোণ থেকে এদেশের মানুষের অন্তরের অসন্তোষ দেখেছিলেন এবং কারণ নির্ণয় করেছিলেন, যার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেছিলেন, সে দৃষ্টিকোণ থেকে আমার দৃষ্টিকোণ সম্পূর্ণ পৃথক ছিল।...সকলেরই সুর ছিল প্রায় এক। তার অধিকাংশ স্থলেই—যারে চাই তারে কেন পাই না, এই অতৃপ্তির সুর ছিল উগ্র এবং সমাজের বিরুদ্ধে তার এই সম্পর্কিত সকল বিধির বিরুদ্ধে আক্রোশ, ক্ষেত্র বিশেষে ছিল বিদ্রোহ।...আমি সাহিত্যক্ষেত্রে এসেছিলাম আলাদা দৃষ্টিকোণ নিয়ে অন্তরের স্বতন্ত্র উপলব্ধি নিয়ে। চৈতালী ঘূর্ণিতে আমি তা প্রথম বলতে চেষ্টা করেছিলাম।...'ধাত্রী দেবতা', 'কালিন্দী'তে নতুন করে সেই কথা বলে আমি সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছি।...রাজনৈতিক বন্ধন মুক্তির আকাঙ্ক্ষার যে দুর্নিবার আবেগ আমি জাতীয় জীবনের স্তরে স্তরে বিভিন্ন ভঙ্গীতে প্রকাশিত হতে দেখেছিলাম, তারই মধ্যে প্রত্যক্ষ করেছিলাম, মানুষের সনাতন জীবনমুক্তির সাধনা। জীবন-মুক্তি বলতে ভয়ের বন্ধন, ক্ষুদ্রতার গণ্ডি, ভাবের পীড়ন, জীবনে জোর করে চাপানো সকল প্রকার প্রভাবের বিরুদ্ধে মানুষ সংগ্রাম করে চলেছে। সেইতার অভিযান।...সে সময়ের রাজনৈতিক বন্ধন ছিন্ন করার আবেগের মধ্যে সেই চিরন্তন মুক্তি-সংগ্রামকেই অনুভব করেছিলাম আমি।" (বীরভূম সাহিত্য সম্মেলনে অভিভাষণ, ১৯৪২)।

আর এই মুক্তি সংগ্রামের অনুভূতি গড়ে উঠেছিল তাঁর প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে। জমিদারের অত্যাচার, অন্ত্যজ শ্রেণীর মানুষের প্রতি অভিজাত মানুষের অবজ্ঞা, ঘৃণা, নির্লজ্জ পাশবিক উৎপীড়ন প্রভৃতি প্রত্যক্ষদর্শী তারাশঙ্করকে সহানুভূতিতে করুণায় উদ্দীপিত করেছিল এবং তাকে সাধারণ মানুষের অকৃত্রিম ঘনিষ্ট সংস্পর্শে এনেছিল। 'আমার সাহিত্য জীবন'-এ তিনি লিখেছেন—"দেশসেবার বাতিক যখন নেশা হয়ে দাঁড়ায় তখন তাতে আর কৃত্রিমতা থাকে না। ...আগুন, ঝড় এবং কলেরা এই তিনটাই আমাদের অঞ্চলে সব চেয়ে বড় বিপদ। এরই মধ্যে ঘুরে বেড়ানো আমার নেশা ছিল। বিশেষ করে ১৯২৪/২৫ সালে আমাদের অঞ্চলে যে ব্যাপক মহামারীর আক্রমণ হয়েছিল তাতে আমি অন্তত আমাদের গ্রামের চারিপাশে ত্রিশ-চল্লিশখানি গ্রামে একাদিক্রমে ছমাস ঘুরেছি, খেটেছি। এই সেবা আমার ব্যর্থ হয়নি। পাথরের দেবমূর্তি ভেদ করে দেবতার আবির্ভাবের কথা যেমন গল্পে আছে তেমনি ভাবেই এই পাপ-পুন্যের রক্তমাংসের দেহধারী মানুষগুলির অন্তর থেকে সাক্ষাৎ দেবতাকে বেরিয়ে আসতে দেখেছি।"

তাই তাঁর "ডাইনীর বাঁশী" গল্পটিকে যখন কোন বিদগ্ধ সাহিত্য-পন্ডিত মনে করেছিলেন নিশ্চয়ই ইউরোপীয় সাহিত্য থেকে চুরি করা, তখন তারাশঙ্কর তাকে বলেছিলেন—"ও আমার দেখা।...স্বর্ণ ডাইনী আমাদের বাইরের বাড়ীর পুকুরের ও পারে থাকত। তাকে আমি দেখেছি।" আর রবীন্দ্রনাথও এ বিষয়ে বলেছিলেন, "এ তারাশঙ্করের সাহিত্যকে কোন নিন্দুক স্থূল অপবাদ দিয়েছিলেন।" এতে মর্মাহত হয়ে রবীন্দ্রনাথের কাছে মতামত চেয়েছিলেন তারাশঙ্কর। রবীন্দ্রনাথ চিঠিতে জানিয়েছিলেন—"তোমার স্থূল দৃষ্টির অপবাদ কে দিয়েছে জানিনে কিন্তু আমার তো মনে হয় তোমার রচনায় সূক্ষস্পর্শ আছে, আর তোমার কল্পনে বাস্তবতা সত্য হয়েই দেখা দেয়। তাতে বাস্তবতার কোনর বাঁধা ভান নেই, গল্প লিখতে বসে গল্প না লেখাটাকেই যাঁরা বাহাদুরি মনে করেন তুমি যে তাঁদের দলে নাম লেখাওনি এতে খুশি হয়েছি।"

তারাশঙ্কর বিভিন্ন উপন্যাসে যে যুগপরিবর্তনের বাস্তব আলেখ্য রচনা করেছেন তাও তাঁর অভিজ্ঞতা পুষ্ট। এ প্রসঙ্গে তিনি বলেছেন : "১৯৩১ সালে জেল থেকে বেরিয়ে এসে সাহিত্য সেবা কর্মে প্রথম ফল আমার 'চৈতালী ঘূর্ণি'। কাঁচা রচনা কিন্তু তার বিষয়বস্তু আমার দেখা জিনিস; এক চাষী জমিদার ও মহাজনের শোষণে এবং অত্যাচারে সর্বশান্ত হয়ে কলে শ্রমিক হল—তারপর মালিকশ্রমিকের বিরোধের ফলে ওই লোকটির মৃত্যু হল। ভদ্রলোকের ছেলে পার্শ্বনায়ক সুরেন—সেও সত্য—সে আজও জীবিত—আজও সে দেশসেবায় নিযুক্ত রয়েছে বীরভূমে। তারপর কালিন্দী, গণদেবতা পঞ্চগ্রাম লিখেছি। তার মধ্যে আমার বিপ্লবের স্বরূপ কল্পনা আমার নিজস্ব। তার মধ্যে

ন্যায়প্রধান, নীতিপ্রধান, সত্যপ্রধান এবং ঈশ্বর বিশ্বাস সুদৃঢ় অটল। যে ন্যায়, যে নীতি, যে সত্যের জন্য বিপ্লবের কামনা—আবাহন, তার উৎস ঈশ্বর-বিশ্বাস। তারই মধ্যে মৃত্যু—অমৃতরাজ্যের সেতু।" ['শিল্পীর স্বাধীনতা', 'দেশ' ১৯৬২]

'রবীন্দ্রনাথ ও বাংলার পল্লী' প্রবন্ধগ্রন্থেও তিনি এই প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার কথা বলেছেন—"আমাদের চারিপাশে যে প্রভূত জ্ঞানের সম্ভার থরে থরে নানা গ্রন্থরাজির মধ্যে গ্রন্থিত ও সজ্জিত তা থেকে আমি জীবনে সামান্যই সঞ্চয় করতে পেরেছি। আমার যেটুকু জ্ঞান বা উপলব্ধি ও অভিজ্ঞতা তার অধিকাংশই আমি অর্জন করেছি আমার সম্মুখে প্রবাহিত প্রত্যক্ষ জীবনের শোভাযাত্রা থেকে। সে শোভাযাত্রায় রাজা ছিল না, ধনী ছিল না, ছিল সাধারণ মানুষ, এ দেশের এখানকার এই অঞ্চলের মানুষ, এখানকার মানুষের দীনদরিদ্র, ক্ষীণকায়, রোদ্রদগ্ধ, তাম্রবর্ণ দেহের মধ্যে যে বিচিত্র প্রাণলীলাকে তাদেরই জীবনের শরিক হয়ে প্রত্যক্ষ করেছি, মনে হয়েছে সেই বিচিত্র প্রাণশালা তার গুঢ় প্রকাশের ওপার থেকে যেন আরও কোন বাণী আকারে ইংগিতে বার বার অস্ফুট কণ্ঠে উচ্চারণ করবার চেষ্টা করছে, এই টুকুই আমার সম্বল। সে সম্বলটুকু আমি লাভ করেছি আমার চারিপাশের জীবন থেকে প্রত্যক্ষভাবে।" (প্রারম্ভিক নিবেদন')।

এই চারপাশের প্রত্যক্ষ জীবনের রূপকার হলেন তারাশঙ্কর। তাঁর শ্রেষ্ঠ গল্প উপন্যাসে পল্লীর মানুষ প্রকৃতি নানা রঙে উদ্ভাসিত। তাই রবীন্দ্রনাথের পল্লীভাবনাকে তিনি বিশ্লেষণই করেননি, হৃদয় দিয়ে অনুভব করেছেন। তিনি দেখিয়েছেন রবীন্দ্রনাথের পল্লীপ্রীতি পল্লীর মানুষকে কেন্দ্র করেই। গ্রামের মানুষের অভাব আছে, ঈর্ষা আছে, গ্রাম্য দলাদলি আছে কিন্তু রবীন্দ্রনাথের শিল্পী চেতনার সহানুভূতিতে মানুষ হয়ে ওঠে সত্য। বঙ্কিমচন্দ্রের 'রাজসিংহ' যখন বাংলার জনচিত্ত জয় করে নিয়েছিল, সেই সময়ে দরিদ্র জীবনের উপকরণ নিয়ে গল্প রচনা করা কোনভাবেই সহজ ছিল না, এখানেই রবীন্দ্রনাথ বাংলা সাহিত্যে পালা বদল ঘটালেন। তাঁর ছোটগল্পে সাধারণ মানুষের দৈনন্দিন জীবনের ছবি ফুটে উঠল।

তৃতীয় বক্তৃতায় তারাশঙ্কর দেখিয়েছেন রবীন্দ্রনাথের মন আর মননে পল্লীসমাজ কেমন সাড়া জাগিয়েছিল। সবাই যখন মনে করেছিলে রাষ্ট্রযন্ত্রের বিপুল জটই সমাজকে চালায় তখন রবীন্দ্রনাথ সমাজকেই প্রাধান্য দিয়েছেন। তিনি দেখিয়েছেন ভারতবর্ষীয় ব্যবস্থায় সমাজের স্থান গৌণ নয় মুখ্য, তারাশঙ্কর বিশ্লেষণ করে দেখিয়েছেন রবীন্দ্রনাথ পল্লীর মানুষের আত্মোন্নতি চেয়েছিলেন এবং সেই পথেই পল্লীর মুক্তি সম্ভব, পল্লীর প্রকৃতি সৌন্দর্যের আধার হয়ে ধরা পড়েছে রবীন্দ্রচেতনায়, তারাশঙ্কর রবীন্দ্রনাথের প্রকৃতি ভাবনাকে পল্লীর প্রেক্ষাপটে বিচার-বিশ্লেষণ করেছেন। মানুষ আর প্রকৃতি, মাটি আর আকাশ, সীমা আর অসীমের সমন্বয়ে যে সৌন্দর্যের জগৎ সৃষ্টি করেছেন রবীন্দ্রনাথ, তারাশঙ্কর তার সঙ্গেই একাত্ম হতে চেয়েছেন। আর সর্বত্রই প্রতিফলিত হয়েছে রবীন্দ্রনাথ ও শান্তিনিকেতনের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা। তিনি রবীন্দ্রনাথকে প্রণাম জানিয়ে বলেছেন—"...জীবনের এই শেষ পর্বে মহাকবির চোখের মায়া অনুসরণ করে আমার শিশুকালের, আমার চিরকালের বাংলা দেশকে বুকের মধ্যে, মনের মধ্যে ফিরে পেলাম।..."

'সাহিত্যের সত্য' প্রবন্ধ সঙ্কলনেও তারাশঙ্কর লেখকের সমস্যা, বাংলার সংস্কৃতির সমস্যা, জনজীবন ও সাহিত্যে বঙ্কিমচন্দ্রের প্রভাব, আধুনিক কাল এবং সাহিত্য ও সমাজে তাঁর প্রভাব, সাহিত্যের সত্য বলতে কি বোঝায়—তার বিস্তারিত আলোচনা করেছেন; এবং সর্বত্রই প্রতিফলিত হয়েছে তারাশঙ্করের ব্যক্তিমনের বিশিষ্ট ছাপ—যা তাঁর গল্প উপন্যাসের মধ্যেও প্রকাশ পেয়েছে।

বিপ্লবের স্বরূপ প্রসঙ্গেও তারাশঙ্কর গান্ধীবাদী; মার্কসবাদে তার কৌতূহল নেই। তবে অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় ব্যক্তি, সমাজ ও রাষ্ট্রকে নিয়ন্ত্রণ করার শক্তির মধ্যে যে সত্যতা আছে তা তিনি উপলব্ধি করেছিলেন। কিন্তু বাস্তববাদ-সর্বস্বতাকে মানতে পারেন নি। তিনি বুঝতে পেরেছিলেন সামাজিক বা অর্থনৈতিক সাম্যই সব নয়। সত্য, প্রেম, অহিংসার সাধনার পথেই মানুষের জীবনের পরম উদ্দেশ্য চরিতার্থ হতে পারে—রক্তক্ষয়ী সংগ্রামের পথে নয়। 'ভারতবর্ষ ও চীন' প্রবন্ধে চীনের জীবন-সত্য ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলেছেন, "সে তো শুধু সমাজতন্ত্রবাদী নয়—সে তার সঙ্গে সমরতন্ত্রবাদী। সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার জন্য সামরিক শক্তির প্রয়োগ অপরিহার্য। তার প্রতীক গাঢ় রক্তবর্ণ, মাটি রক্তাক্ত না হলে তার উপর তার তন্ত্রের ভিত্তি সুদৃঢ় হয় না। এই তার কাছে সুমহত্তম ন্যায় ও নীতি।" আর ভারতের কথা প্রসঙ্গে তিনি মানবতন্ত্রের সন্ধান পেয়েছেন ; "এই কালের যে মহাপ্রকাশ যাকে দেখে মনে হয়

এ ভারতবর্ষ অতীতের ভারতবর্ষ ও তার সেই আদর্শের বিরোধী বা তার থেকে সম্পূর্ণ পৃথক, তাকে কলব এই ভারতের ধর্ম ও আত্মার প্রতীক সন্ধান করে দেখতে। আমাদের পুরাণে আছে স্রষ্টা চতুর্মুখ। চারটি মুখ আমার চোখের সামনেও ভেসে ওঠে। মহাকবি রবীন্দ্রনাথ ভারতের বাণীমুখ, মহাত্মাগান্ধী ভারতের ধ্যানমুখ, নেতাজী সুভাষচন্দ্র ভারতের শৌর্যমুখ, প্রধানমন্ত্রী শ্রীজওহরলাল ভারতের কর্মমুখ। চারটি মুখের ললাটই ত্যাগের তিলক চিহ্নে উজ্জ্বল। প্রত্যেকের কাজেই সত্যের দ্বারা মিথ্যা পরাভূত হিংসা মিথ্যা, প্রেম সত্য। মৃত্যু পরাভূত, অমৃত করায়ত্ত। প্রতিষ্ঠা রাজাসনে নয়, মানুষের মনোসিংহাসনে। সর্বশেষ সত্য প্রেম অমৃত কর্ম সমস্ত কিছুর একমাত্র আধার মানবধর্ম। এই ধর্মকে আশ্রয় করে ১৯৪৭ সালে যে নবীন ভারতবর্ষের অভ্যুদয় হয়েছে তার পতাকার প্রতীক ধর্মচক্র, তার আদর্শ বিশ্বমৈত্রী, তার নীতি অহিংসা এবং তার শীল পঞ্চশীল।"

এই জন্যেই দেখি গণবেদতার নায়ক দেবুঘোষ গান্ধীবাদী; প্রেম, অহিংসার পথে সে নতুন সমাজ গঠনে আগ্রহী; মার্কসবাদী বিশ্বনাথের সঙ্গে সে সমাজের সঙ্গে অর্থনীতির সম্পর্ক নিয়ে আলোচনা করতে চায়নি। মার্কসের রচনাও দেবুর কাছে অস্পৃশ্য। কিন্তু জীবনের শেষপর্বে এসে 'লেনিন শতবার্ষিকী উপলক্ষে' [সাপ্তাহিক 'অমৃত', শুক্রবার, ৩ রা বৈশাখ ১৩৭৭] শীর্ষক প্রবন্ধে তিনি বলেছেন :

ক. "আমি ভারতবর্ষের মানুষ, আমার সম্মুখে একদা মহাত্মাগান্ধীর জীবন ও বাণী মানব ভবিষ্যতের কুয়াশাচ্ছন্ন অনিশ্চয়তা ছিন্ন করে একটি স্থির আলোকোজ্জ্বল পথরেখা যেন মনের চোখের সম্মুখে উদ্ভাসিত করে তুলেছিল। এবং সারা জীবনই আমি আমার জীবনের আচরণের মধ্যে দিয়ে সেই পথ ধরেই চলতে চেয়েছি। কিন্তু তার সঙ্গে আজ মুক্ত কণ্ঠে বলছি লেনিনও আছেন। গান্ধীজীর বাণী এসেছিল প্রথম, তারপর এসেছিল লেনিন।"

খ. "আজ এই মহান মানব প্রেমিক ও মানবেতিহাসের অসামান্য ও অদ্বিতীয় নেতার জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষে সেকালের স্মৃতিকথা স্মরণ করে অকপটেই বলি—১৯১৭ সাল থেকে ১৯২১ সাল পর্যন্ত অর্থাৎ জাতীয় জীবনের গান্ধীজীর আগমনের পূর্বকাল পর্যন্ত একমাত্র লেনিনই ছিলেন আমার জীবনের নায়ক।'

গ. "মহান লেনিনের প্রভাবও আমার উপর কম নয়। সত্য বলতে গেলে বলতে হবে—রুশবিপ্লব এবং মহান লেনিনই সকল মানুষের মুক্তির বার্তা ও পন্থাই আমাকে প্রথম জ্ঞাপন করেছিল।.....মহাত্মা লেনিনের শ্রেণীহীন সমাজ, সাম্যবাদের মহান অধিকারের কল্পনা সুন্দর শোষণহীন সমাজের ছবিও ঠিক ততখানি আকর্ষণ করেছিল। এবং আজ এই ১৯৭০ সালের এপ্রিল মাস পর্যন্ত ভারতবর্ষের কম্যুনিজম পন্থী রাজনৈতিক দলগুলির সঙ্গে পন্থা নিয়ে রূঢ় মতবিরোধ সত্ত্বেও মহান লেনিনের প্রতি আমার অনুরক্তি এবং আকর্ষণ বিন্দুমাত্র হ্রাস পায়নি। আমাদের দেশের বিভিন্ন রাজনৈতিক দলগুলির সঙ্গে আমার যত মত-পার্থক্যই থাক, এই আশ্চর্য মানববন্ধুটি আজও আমার একজন অন্তরঙ্গ বন্ধু এবং আজও তিনি আমার পথপ্রদর্শক।"

—এইসব মন্তব্য থেকেই বোঝা যায় তারাশঙ্করের জীবনে ও সাহিত্যে মহাত্মাগান্ধী যেমন ধ্রুবতারা ছিলেন তেমনি 'আশ্চর্য মানববন্ধু' লেনিনও ছিলেন তাঁর পথপ্রদর্শক। কিন্তু লেনিনের লড়াই-সংগ্রাম ছিল জমিদার শ্রেণী, ধনীক শ্রেণী, শোষক শ্রেণী তথা বুর্জোয়া শ্রেণীর বিরুদ্ধে এবং শোষণহীন, শ্রেণীহীন সমাজব্যবস্থার পক্ষে। আর তারাশঙ্কর ছিলেন রক্তসম্পর্কেই জমিদার পরিবারের সন্তান; প্রজাপীড়ক জমিদারী রক্ত বইছিল তাঁর শিরায় ধমনীতে। তাই মানবিকবোধের বিচারে লেনিন তাঁর অন্তরঙ্গ বন্ধু বা পথপ্রদর্শক হলেও শ্রেণীস্বার্থের অমোঘ আকর্ষণেই ইতিপূর্বে তিনি কখনো রুশবিপ্লবের মহান নায়কের নাম-উচ্চারণ করেন নি; যে সত্য স্বীকার করলেন জীবনের শেষ সীমায় এসে। তাঁর সাহিত্যে ঐতিহ্যের সঙ্গে প্রগতির দ্বন্দ্বের এটিও একটি মূল কারণ। তাছাড়া গান্ধীজি ছিলেন কাজের মানুষ, জীবনের বিভিন্ন পর্বে তাকেই স্মরণ করেছেন তিনি; লেনিনকে ততটা গুরুত্ব দেননি। কিন্তু লেনিন সাধারণ মানুষের প্রতি যে দরদ ও সহানুভূতি নিয়ে মানুষের অসহায়তা থেকে, অত্যাচার-শোষণ থেকে মুক্তির জন্যে লড়াই করেছেন ; ন্যায়ের জন্যে, সত্যের জন্যে মানুষকে জাগিয়ে তোলার চেষ্টা করেছেন....সেই রুশ বিপ্লবের প্রভাব কার্যকর হয়েছে তারাশঙ্করের সাহিত্যের উপাদান নির্বাচনে। তাই দেখি তারাশঙ্কর হয়েছেন মানবতাবাদী, সাধারণ মানুষের পরম বন্ধু।

তিনি চেয়েছেন পরাধীনতা থেকে, দাসত্ব শৃঙ্খল থেকে মানুষের মুক্তি; এবং সেটাই যেন তাঁর জীবনের তপস্যা। 'আমার কথা'তে [শনিবারের চিঠিতে ১৩৭১ সালের আষাঢ় থেকে ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত] তিনি

সেকথা স্পষ্ট করে বলেছেন : "আমার সাহিত্যজীবনে যে তপস্যার ধারা ছিল, দেশের স্বাধীনতা লাভের সঙ্গে সঙ্গে তার ধারায় ছেদ পড়ল। রইল যেটা, সেটা নিত্যকর্ম পদ্ধতি মতে আচার-আচরণ পালনের মত কিছু।"

সব মিলিয়ে বলা যায়, তারাশঙ্কর, যুগসন্ধিক্ষণের কথাকার—যুগবদলের, পালাবদলের রূপকার। "...তারাশঙ্কর দেখতে পেয়েছিলেন গ্রাম বাংলার ভূমিতে, কর্মে, মানসিকতায় প্রাচীন ও নবীনের সংঘর্ষ। একদিকে তিনি জলসাঘরের জমিদারদের চিত্র অঙ্কন করেন, অন্যদিকে মোটরের হর্ণকে তিনি ভুলতে পারেন না। একদিকে ন্যায় পঞ্চানন তাঁর ধ্যানে অনন্যরূপ লাভ করে, অন্যদিকে অনিরুদ্ধের অস্থিরতা তাঁর সমবেদনা পেয়ে যায়। হাঁসুলী বাকের উপকথায় বনোয়ারি কবালীর জীবনের সূত্রও একই সমাজ মনস্কতার ফল। কিন্তু তারাশঙ্কর যেহেতু পরিবর্তমান জীবনের রূপকার সেহেতু তিনি এই সংঘর্ষে প্রাচীনের বিদায়কে সরলীকরণের দ্বারা চিত্রিত করেননা। তিনি ঠিকই বুঝেছিলেন বন্দরের কাল শেষ হয়েছে কিন্তু কালান্তরে পৌঁছবার রাস্তাটি রক্তাক্ত, কঠিন আর মর্মান্তিক। পুরনো মূল্যবোধ সহজে নতুনকে ছেড়ে দিতে চায় না তার অধিকারবোধ। বিদায় নেবার পূর্ব মুহূর্তেও তার বিশ্বাসের ভূমিকে সে আঁকড়ে থাকতে চায়। এইআঁকড়ে থাকার অহংকার এবং কালের পরিবর্তনের কাছে সেই অহংকারের অসহায় রূপ তারাশঙ্করের কথা সাহিত্যে কঠিন মধুর রূপ নিয়েছে।"[১]

সূত্র : ১। বিজিত কুমার দত্ত—'তারাশঙ্কর রচনাবলী' দ্বাবিংশ খণ্ড; ভূমিকা; পৃ—ক

শব্দ সন্ধান

সোমরাজ ঘোষ : বি. এস. সি, দ্বিতীয় বর্ষ

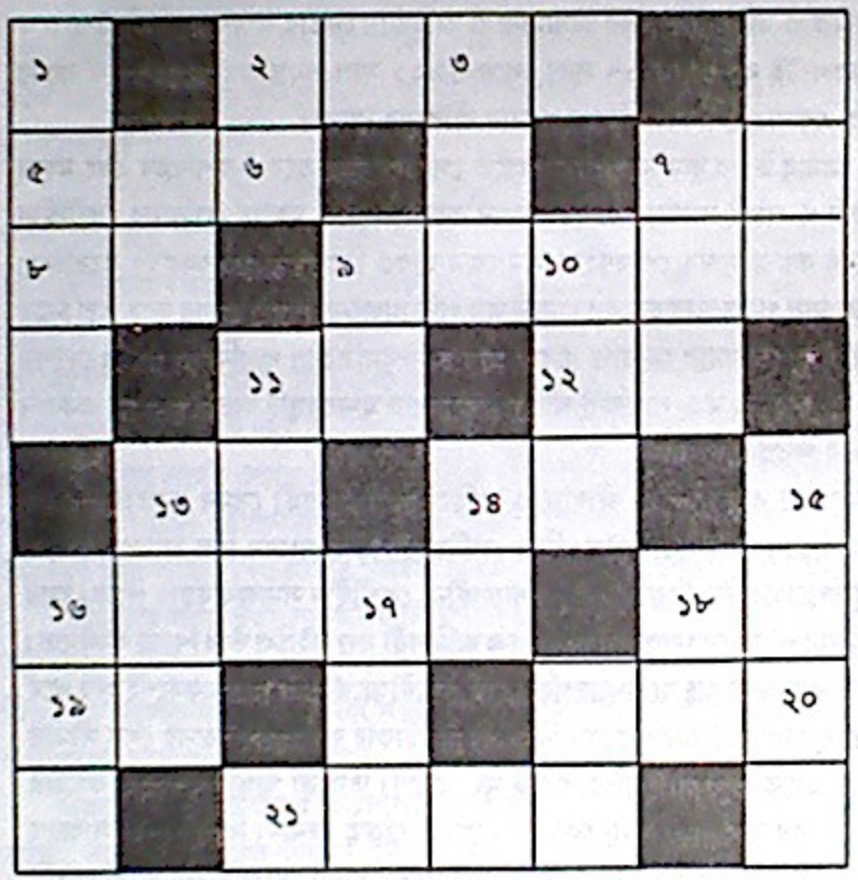

□ পাশাপাশি— (২) শুদ্ধদন পুত্র, (৫) তপন, (৭) "হায়——হায়", (৮) খুন——, (৯) ভোলানাথ, (১১) পদাভরণ, (১২) বিতরণ, (১৩) 'গুপী গাইন বাঘা বাইন'-এর পত চরিত্র, (১৪) সীতাকন্যা, (১৬) শিবনন্দন, (১৮) —লোভে তাঁতি নষ্ট, (১৯) বাজনা বিশেষ, (২০) রাজীব (২১) কমল।

□ উপর-নীচ—(১) বুদ্ধদেব, (২) মূল্য, (৩) মাঝিদের দেবতা, (৪) লাওয়ারিশ, (৬) মঙ্গল, (৭) উত্তর ভারতের একটি স্বাস্থ্যকর ভ্রমণের জায়গা, (৯) ফল বিশেষ, (১০) জয় গোস্বামী যা লেখেন, (১১) ইন্দ্র, (১৩) ছল, (১৪) লে-আও, নিয়ে এস, (১৫) মকরধ্বজ, (১৬) শিবঠাকুর (১৭) "কোথায় এমন——ক্ষেত্র", (১৮) কম, (২০) খুড়োর——।।

স্বাধীনতার পঞ্চাশ বছর—কিছু ভাবনা

অনিন্দিতা ব্যানার্জী : বি.এস.সি., দ্বিতীয়বর্ষ

"জননী জন্মভূমি স্বর্গদপি গরীয়সী।" বন্দে মাতরম। মেরা ভারত মহান। আমাদের দেশ ভারতবর্ষের স্বাধীনতার পঞ্চান্ন বছর পূর্ণ হল। স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তী পালিত হচ্ছে নানা ভাবে। এগিয়ে এসেছেন ব্যক্তি, প্রতিষ্ঠান, রাজ্য এবং রাষ্ট্র। ১৯৪৭ থেকে ১৯৯৭ অনেকগুলো বছর পেরিয়ে এলাম আমরা ভারতবাসীরা। কিভাবে পেরোলাম? মসৃণ? বাধাহীন? নির্দিষ্ট লক্ষ্যে না উদ্দেশ্যহীন এ যাত্রা? সাফল্যের খতিয়ান না ব্যর্থতার ইতিহাস? এই সন্ধিক্ষণে মূল্যায়নের প্রয়োজন আছে না নেই? পৃথিবীর বৃহত্তম গণতন্ত্রের এবং মিশ্র অর্থনীতির পাঁচ দশক কেমন কাটল? একটা সঠিক পর্যালোচনার খুব দরকার একথা কেউই অস্বীকার করবেন না।

১৪ই ফেব্রুয়ারী ১৯৯৮ সকাল ৯ টা। দূরদর্শনে দেখছিলাম ইরাবতীর ধারে নেজর ধীলনের পদচারণা। পেছনে পাহাড়। এখানেই ১৯৪৫ সালে সত্যিকারের স্বাধীনতার যুদ্ধ হয়েছিল। নেতাজীর সহকর্মী নেজরের স্মৃতিচারণা আমাকে নতুন করে ভাবাচ্ছিল। আমি যেন ৫০ বছর পেছনে চলে যাচ্ছিলাম। এক রোমাঞ্চকর অনুভূতি জাগছিল ৫০ বছর পরেও আজকের এই পরিপ্রেক্ষিতে। "কদম কদম বাড়ায়ে যা" এই সুরমূর্ছনার সঙ্গে এক সত্যিকারের স্বাধীনতা সংগ্রামী যখন সেদিনের সেই সত্যি সংগ্রামের নিখুঁত বর্ণনার ফাঁকে বার বার বলছিলেন এই স্থানটা আমার কাছে অতি পবিত্র, আমার চোখ তখন স্মৃতি নেদুর, কিছুটা আর্দ্র ও। এই ৫০ বছর পরেও তো দেশটা আমাদের কাছে তেমনি পবিত্র। অন্তত থাকা উচিত। পবিত্রতা কি শুধু মন্দিরে-মসজিদে? সবার ওপরে দেশ, দেশের মানুষ। এই ভারতে আমার জন্ম। অবশ্যই স্বাধীনতা প্রাপ্তির অনেক পরে। এই ভারতেই আমি লালিত হচ্ছি। এই ভারতেই কাটাব আরও অনেক বছর। কিন্তু কিভাবে কাটছে, কিভাবে কাটবে আগামী দিনগুলো বা আরও ৫০ বছর। যেমন ভাবে কেটে গেল বিগত ৫০ বছর না এবার সত্যিকারের স্বাধীনতার স্বাদ পাবে মুষ্টিমেয় কিছু নয় আপামর ভারতবাসীরা, যে ভারতবাসীরা আজও দুমুঠো খেতে পায় না, যে ভারতের সক্ষম যুবক যুবতীর চাকরি খুঁজতে জীবনের শ্রেষ্ঠ সময়টা পেরিয়ে যায়, যে ভারতে লছমনপুর বাথে নামে কোন জায়গায় রাতের অন্ধকারে পশুশক্তির কাছে অসহায় আত্মসমর্পন করে বার বার হীনদরিদ্র অথচ ভোট দেওয়া কিছু মানুষ, রণবীর সেনার হাতে হরিজনদের মৃত্যু হয়। যে ভারতে টাকার অভাবে উন্নয়ন ধনকে গেলেও প্রায় বছর বছর ভোট হয়, যে ভারতে ৭০ ভাগ লোক এখনও গ্রামে বাস করে এবং চাষ বাসই যাদের জীবিকা অথচ ফসলের দাম পায়না, যে কৃষিজীবি ভারতে সারের দাম নাগালের বাইরে চলে যাচ্ছে সাথে ভরতুকি তুলে নেবার রক্তচক্ষু ; সেই ভারত কি স্বাধীনতার শহীদরা চেয়েছিলেন? এই রাজনীতি সচেতন ভারতে স্বাধীনতার ৫০ বছর পরেও মেয়েদের জন্য লোকসভায় ৩৩% আসন সংরক্ষন করা গেল না। আজও রাতের ট্রেনে ভারতবাসীরা নিরাপদ নয়। আজও পনের বলি হয় শীলা, সুনিত্রা নেহারা। আবার এই ভারতেই দেখা মেলে কৃষ্ণপদদের। যিনি পনপ্রথার বলি এক লগ্নভ্রষ্টাকে উদ্ধার করতে এগিয়ে আসেন।

মাঝে মাঝে মনে হয় আমাদের কারুরই কোন মাথা ব্যথা নেই। জাতীয় জীবনে পরিচ্ছন্নতার প্রশ্ন নেই। জাতপাত, দুর্নীতি, অশিক্ষা, বুভুক্ষা, পরিবেশ দূষণ, শোষণ আর নির্বাচন ইত্যাদির মধ্যে আমরা ঘুরপাক খাচ্ছি। তাই একটা জাতি হিসাবে এই ৫০ বছরে আমাদের যে অগ্রগতি কাম্য ছিল তা হয় নি। এখনও আমরা তৃতীয় বিশ্বের অনুন্নত বা মতান্তরে নাকারি উন্নত দেশ। অথচ দুর্নীতিতে আমরা পৃথিবীর সামনের সারির দেশগুলোর খুব কাছেই আছি। দুর্নীতি আমাদের পিছু ছাড়ছে না। কিন্তু সৎ, সচ্চরিত্রের মানুষ ভারতে নিশ্চয় আছেন। জীবনের সর্বক্ষেত্রে তাদের এগিয়ে আসতে হবে। দুর্নীতি, সাম্প্রদায়িকতা ও জাতপাত এবং সংকীর্ণ রাজনীতির উর্দ্ধে উঠে যারা আমাদের নিয়ে যাবেন সত্যিকারের স্বাধীনতা উত্তর শক্তিশালী ও সমৃদ্ধশালী সেই ভারতে আগামী প্রজন্মকে যে দেবে এক নতুন বার্তা। সর্ব অর্থে যেন মিলিত কণ্ঠে গেয়ে উঠতে পারি, 'এমন দেশটি কোথাও খুঁজে পাবে নাকো তুমি'। আশায় আছি, থাকবও।

এখন এই ৫০ বছরে কিছু পরিসংখ্যান নিয়ে নাড়াচাড়া করা যাক। (সূত্র : সাম্প্রতিক বিভিন্ন সংবাদপত্র)

পরিবেশ : শুধু বায়ু দূষনের কারণেই আমাদের দেশে মৃত্যু ঘটছে ৪০ হাজারের উপর মানুষের। কলকাতার স্কুল অব

এনভয়ারনমেন্টাল স্টাডিজ এর হিসাবে কলকাতার বাতাসে যে পরিমান বেঞ্জোপাইরিন থাকে তাতে ব্যস্ত রাস্তার মোড়ে হকার বা অন্য কেউ রোজ ৮ ঘন্টা কাজ করলে ১৫ বছরের মধ্যে তার ক্যানসার রোগে আক্রান্ত হবার সম্ভাবনা। চিপকো আন্দোলনের পর উত্তরপ্রদেশের ১০০ বর্গ কিলোমিটার অঞ্চলে গাছ কাটা নিষিদ্ধ হয়েছে। সুন্দর লাল বহু তনার ৫৬ দিন অনশনের পর টেহরি বাঁধের নির্মাণ কাজ স্থগিত রাখা হয়েছে।

তথ্য প্রযুক্তি : নবম যোজনাকালে আগামী চার বছরের মধ্যে ভারতে ইন্টারনেট ও অন্য তথ্য সংযোগ ব্যবস্থার ব্যাপক সম্প্রসারণের জন্য কেন্দ্র একটি জাতীয় তথ্য পরিকাঠামো প্রকল্প নিয়েছে। ভারত সরকারের ইলেকট্রনিক্স দফতরের সচিব আরও জানিয়েছেন যে আগামী দুবছরে ইন্টারনেট গ্রাহকের সংখ্যা বর্তমানে ১ লক্ষ থেকে বাড়িয়ে ২০ লক্ষ করার কর্মসূচি নেওয়া হয়েছে। নবম যোজনার শেষে দেশে হার্ডওয়ার ও সফ্‌টওয়ার ব্যবসাও বেড়ে ২ লক্ষ ৩৮ হাজার কোটি টাকায় দাঁড়াবে।

অর্থনীতি : বাজারে মন্দা, মুনাফা কম, উপভোক্তরা খরচ করতে অনিচ্ছুক ; শেয়ার বাজারের কাহিল অবস্থা। অথচ এই অবস্থার মধ্যেও ১৯৯৭-৯৮ অন্তে আশা করা যায় দেশের প্রকৃত আয় বা আভ্যন্তরীন উৎপাদন (জি.ডি.পি.) বাড়বে ৬ শতাংশ। অবশ্য অর্থনৈতিক পুনর্গঠন শুরু হওয়ার ফলে আমাদের প্রত্যাশা ৮ বা ৯ শতাংশে আয় বৃদ্ধি কারণ পৃথিবীর নানা দেশে ১০ শতাংশে আয় বৃদ্ধি সম্ভব হয়েছে।

নির্বাচন : বিশ্বের বৃহত্তম গণতান্ত্রিক দেশে দ্বাদশ লোকসভা নির্বাচনের আনুমানিক খরচ ৮০০ কোটি টাকা। প্রার্থীকে জমা দিতে হবে দশ হাজার টাকা। প্রার্থীর নির্বাচন খরচের স্বাধীনতা হল ১৫ লক্ষ টাকা। আগের তুলনায় এই নির্বাচনে প্রার্থীর সংখ্যা দুই তৃতীয়াংশ কমে গেছে। গত বছরের চেয়ে ৭১% কম মনোনয়ন পত্র জমা পড়েছিল এবার (৬ হাজার ১৩২ জন)। মহিলা প্রার্থীর সংখ্যা ২৫২, যেখানে গতবার ছিল ৫৯৯ জন।

সরকারী আয় ব্যয় : রাজস্ব থেকে সরকারের আয় এখন ১.৫৩ লক্ষ কোটি টাকা। আর ঋণ-পরিশোধ ও সুদ বাবদ সরকারের খরচ ১.৪২ লক্ষ। এরপর যে টাকাটা পড়ে থাকে তাতে সরকারের ঠিক ১৭ দিনের খরচ চলে। বাকি ৩৪৮ দিনের খরচ চালাতে আরও ধার করতে হয়। এ অবস্থা বদলানো সম্ভব, যদি সরকারি ঋণের একটা উর্দ্ধসীমা বেঁধে দেয় নতুন সংসদ। এ ব্যাপারে প্রধান তিনটি রাজনৈতিক দলই একমত।

পরিসংস্থানের ইতি টানা যাক। আমাদের সামনে এখন দিগন্ত বিস্তৃত ভারতবর্ষ। আমাদের চোখে অনেক স্বপ্ন। আমাদের মত ছাত্রছাত্রীদের অনেক দায়িত্ব। দেশ চায় সুনাগরিক। যারা ভারতের অগ্রগতির রথকে টেনে নিয়ে যাবে বিংশ শতাব্দীর দিকে। ভারত যে আবার জগতে শ্রেষ্ঠ আসন নেবে তাতে কোন সন্দেহ নেই।

রাজনীতিতে ছাত্র-ছাত্রীদের অনীহা

রিতাশীশ ভট্টাচার্য : বোটানি অনার্স, দ্বিতীয় বর্ষ

কিছুদিন আগেও বিভিন্ন দেশের রাজনৈতিক আন্দোলনে হাজার হাজার ছাত্র-ছাত্রী অংশ নিত ও দেশের রাজনৈতিক অবস্থার পরিবর্তন ঘটাতো। দেশের রাজনৈতিক ও সামাজিক পরিবর্তনে ছাত্র-আন্দোলনের গুরুত্ব অপরিসীম। কারণ সর্বতই তারুণ্যের জয়। 'আঠারো বছর বয়স মানে না কোনো বাধা'। আমাদের দেশের স্বাধীনতা আন্দোলনেও বহু তরুণ-তরুণী স্বতঃস্ফূর্ত আত্মত্যাগ করে আমাদের এই স্বাধীনতাকে মহিমান্বিত করেছে। তাঁরা অনেক কষ্ট স্বীকার করে, বহু জেল খেটে, পুলিশের অত্যাচার সহ্য করে তাদের আদর্শকে বহন করে চলেছিলেন ও পরবর্তী কালে সেই সব ছাত্ররাই দেশের রাজনৈতিক হাল ধরেছেন। শুধু আমাদের দেশেই নয়, সারা পৃথিবীজুড়ে বিভিন্ন দেশের ছাত্ররা শ্রমিক শ্রেণীর সাথে একাত্ম হয়ে লড়াই করেছে ও সমাজধারাকে পালটে দিয়েছে। তাই ছাত্রদের এই সংগঠিত আন্দোলনকে ভয় করে শাসকশ্রেণী। কেননা তারা জানে এই ছাত্ররাই পরবর্তীকালে তাদের উত্তরসূরী হবে। যদি এখনি তারা শাসক ও শোষিত শ্রেণীর ভেদাভেদ বুঝতে পারে তবে তাদের শোষণের হাতিয়ার ভেঙে চুরমার হয়ে যাবে। তাই তারা প্রচন্ড সাবধান এ ব্যাপারে। "ছাত্রনাং অধ্যায়ন তপঃ" এই মন্ত্র খুব শিশুকাল থেকেই তাদের মনের মধ্যে ঢুকিয়ে দেওয়া হয়। ছাত্রদের কোনোদিকে দেখার দরকার নেই। কেবল পড়াশুনা করা ও পরে শাসকশ্রেণীর প্রতিনিধি হয়ে প্রচলিত সমাজব্যবস্থাকে কায়েম করাই তাদের উদ্দেশ্য। ছাত্র-ছাত্রীদের রাজনীতি থেকে দূরে রাখার আপ্রাণ চেষ্টা করেন তারা। এই প্রক্রিয়ায় তাদের প্রধান হাতিয়ার হলো শিল্প, সাহিত্য, সিনেমা, থিয়েটার, রেডিও, টেলিভিশান ও কিছু বাজারি সংবাদপত্র। (কিছু সংবাদকে অতিরঞ্জিত করে প্রকাশ করা হয় যাতে শাসক-

শ্রেণীর সুবিধা হয়)। তাছাড়া ধর্মের অপব্যবহার তো রয়েইছে। শিশুকাল থেকেই মনের ভেতর রাজনীতির প্রতি এক প্রচণ্ড অনীহার ভাব সৃষ্টি করা হয়। এমন একটা সূক্ষ্ম প্রচার করেন যে রাজনীতি করাটা যেন একটা ধান্দার ব্যাপার। নিজেরটা গুছিয়ে নেওয়ার আয়না। আজকালকার সমাজ চলছেই Give and Take Policy-তে, তাই বেশার খাটা বোকামি। তাছাড়া আদর্শ ধুয়ে কি জল খাবে? একটা মিথ্যা প্রচার করা হয় যে আগে যারা দেশের কাজ করতেন তারা সবাই ভীষণ মহান (অনেকে সত্যিই মহান) আরএখন যারা রাজনীতি করছেন তারা সবাই ধান্দাবাজ। এইভাবে ধীরে-ধীরে ছাত্র-ছাত্রীদের মনে রাজনীতি সম্বন্ধে এক বিরূপ ধারণার সৃষ্টি করে চলেছেন শাসকশ্রেণী। রাজনীতিতে যে ছাত্র-ছাত্রীরা নেই তা নয়। কিন্তু সবই যেন ওপর-ওপর একটা দায়সারা ভাব। এক-একটি ছাত্র সংগঠনে আদর্শগতভাবে আছে মাত্র দু-চারজন। তারা আমাদের নমস্য। কিন্তু অধিকাংশ ছাত্র-ছাত্রীরাই ইউনিয়ন করে কলেজে একটু নাম করার জন্য। ব্যক্তিগতভাবে যারা দায়সারা সংগঠন করে তারা কেউই খারাপ ছেলে বা খারাপ মেয়ে নয়। কিন্তু ভবিষ্যতের কথা ভেবে ও চাকরী, ব্যবসা বাণিজ্য প্রভৃতির অবস্থা দেখে তারা ভয় পেয়ে যায়। কেননা এখন প্রতিযোগিতার যুগ। একটু এদিক-ওদিক হলেই বিপদ। আর একটি ব্যাপারে আজকালকার ছাত্র-ছাত্রীরা উদাসীন তা হলো নিজেদের শিল্প সংস্কৃতি। যদি নিজেদের সংস্কৃতির ওপরই শ্রদ্ধা না থাকে তাহলে স্বদেশকে ভালোবাসবে কি করে? হিন্দী সিনেমার (একটু ভাবলেই বোঝা যায় তার মধ্যে বিনোদনের নামে আছে উদ্ভট বিষয়বস্তু) টিকিট পাওয়ার জন্য সিনেমা হলের সামনে যুবক-যুবতীদের যে ব্যাকুলতা সেটা কি সুস্থ মানসিকতার পরিচয়? অবশ্য এক্ষেত্রে বলা যায় যে আমাদের নিজেদের বাংলা সিনেমাই বা আলাদা কি? ঠিক কথা। কিন্তু বাংলার নির্দেশকরা যখন দেখেন যে "দিল তো পাগল হ্যায়" মার্কা সিনেমা কোটি কোটি টাকা কামাচ্ছে তখন তারা "মন তো হু হু করে" গোছের ছবি করে কিছু টাকা লোটে, কিন্তু সেই সিনেমা করতে গিয়ে যা দাঁড়ায় তা হলো 'হ য ব র ল'। এর বিরুদ্ধে ছাত্ররা রুখে দাঁড়ালে নিশ্চয় এর প্রতিকার সম্ভব। এ ছাড়াও আরো একটা ব্যাপারে ছাত্রছাত্রীরা ভীত। দুর্নীতি যেভাবে অক্টোপাসের মতো আমাদের দেশের রাজনীতিকে জড়িয়ে ধরেছে তাই দেখে ছাত্রছাত্রীরা ক্রমশ রাজনীতি থেকে পিছু হটছে। দুর্নীতি নামক ব্যাধিটি আমাদের সমাজব্যবস্থাকে যেভাবে কুরেকুরে খাচ্ছে তা এইডস্ বা ক্যান্সারের চেয়েও ভয়ানক। এর একটা প্রচ্ছন্ন ছায়া এসে পড়েছে ছাত্রছাত্রীদের জীবনে ও তারা মানসিকভাবে এর শিকার হচ্ছে। কিন্তু এর মধ্যেও আমাদের আশা রাখতে হবে। কেননা 'বাংলার মাটি দুর্জয় ঘাটি।' শুধুমাত্র রাজনীতি নয়, সমাজ পরিবর্তনের কথা মাথায় রেখে চলতে হবে। রাজনীতি মানে সমাজের নীতি, জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে উন্নতির নীতি, দুর্নীতিগ্রস্ত সমাজব্যবস্থাকে উপড়ে ফেলার নীতি।

সমাধান—

অ	■	দ	শ	ব	ল	■	অ
মি	হি	র	■	দ	■	মা	না
তা	ত	■	তা	র	ক	না	থ
ভ	■	ম	ল	■	বি	লি	■
■	বা	ঘ	■	আ	তা	■	র
পি	ক	বা	হ	ন	■	অ	তি
না	ল	■	রি	■	ক	ম	না
কী	■	শ	ত	দ	ল	■	থ

Blind Lane

Sibendu Chakraborty;
English Hons. 2nd Year,

I walk beyond the crowded street
Slowly, slowly on and on.
I walk by and the life of heat
Step by step, and then suddenly gone!

The cemetey lying upon the blind lane
Imitates all our liveliness in stillness
And I do sit amidst it then
For all my languor seems to be
absorbed in the darkness.

For I know, I might be lost
In such a silent harmony
But still my heart yearns to be its lost
For I find myself in the monotony.

For I know, an oasis of perfect peace
Resides in my own heart
But I dare not want my heart to be kissed
For the illusion may make you hurt.

For again, when I want to return
And desire to go back then
I discover that it's not my turn
As I am locked in the blind lane.

Poetry—An Unveiling

Suchismita Mukherjee
Pol Sc. Hons. 3rd Year

Enlivening the thoughts,
And putting love in one's heart;
One gets the essence of poetry.

Tuning the thoughts of a mind,
And blending it with magical colours;
One discovers the art of poetry.

Setting free a caged mind,
And preventing a flower from withering;
One finds the freshness of poetry.

Uniting people all over the world,
And putting rhythm in their lives;
One wonders at the achievement of poetry.

Poetry makes my wild dreams come true,
And point a warmer hue;
I thank the Eternal Being,
For filling colours in me.

Mother

Amartya Pal; Class-XII, Science

Thank you for walking by my side,
Thanks for your push, when those
Little incidents of childhood
Punctured [holes through] my pride.
And on those days when the sun hid away,
You urged me to go out and play.
When one day as an angry youth
I threw my first stone,
You yelled and smashed me to the bone.

I thank you,
For letting the child grow up
And when you felt I could walk alone,
You left me for your heavenly home.

To The Full-Moon Eve.

Rajib Chatterjee
English Hons. 2nd year

Oh! The 'Moonlit Sweet Eventide',
Alight on the dreaming earth;
Let Thy speechful quietude start—
It's sweet tune with mirth.
Balmy zypher's blowing, the—
Mimosa's getting abashed,
By the rustling of dry leaves,
Chirping Magpie becomes flushed
The betrothed maiden demurs,
To sing her love song;
But the Nightingale tells
Carry on, there's nothing wrong'
The bright vesper looks itself
Through the still streams,
(And) the Queen-Moon hath started,
To see her sweet dream.

Optimism

Sukanya De ; B.Sc, 2nd year.

Many a times this happened so,
While speaking to silence,
All by myself ;
I explored a new world,
Inside and outside me :
Somewhere, sometimes,
Some sweet little smile,
Crept up on tired lips,
Originating from deep inside.
Some weary lonely faces around me,
Lost in their own worldly affairs,
Some lonely islands,
Struggling to be themselves,
Getting more and more concentrated
Around their own shores of egos ;
This is a world of shadows, we are nothing!
Just nothing but mere illusions,
Like emptiness in a busy crowd ;
It has been hard it's always hard,
To dwell ; having such empty souls around,
To communicate, to understand,
Unspoken verses of distressed hearts.
It has been difficult to reach out
Untangling, knots of complications.
Life's getting more and more piled up
I tried, as I've always tried
I realised ;
Life is much more than breathing merely!
Life is being like life ;
Breathing and living, with others
For those, who starve for life.
It feels just wonderful to get scattered
Like happiness ;
In tormented heats around
In noise and solitude ; at times
When the whole world seems to be up over
You!
And times, when you're on the top of the world!
Then and always ;
When there are many around you,
And when there is just no one
"You're never alone!"
Surpassing all illusions of your being,
There's the fire inside you
That can warm up your way
And others too!
Fulfilling those aspirations, dreams
Which are dormant :
And yet there's much left,
That's hope ;
Like the sparkle that was lost
In tired eyes ;
And then, somewhere a song is born
A song full of love, dreams,
And happiness

INDIA INTER UNIVERSITY

ROWING CHAMPIONSHIP :

RUNNER UP.

PARTICIPANTS FROM—
ASUTOSH COLLEGE

1. SUKANTA BARDHAN (CAP. OF C.U. ROWING TEAM)
2. SILADITYA MONDAL
3. SANJIB DEY
4. MANASHI NASKAR

Tolerance : A discourse

Kasturi Ganguly ; Sociology Hons, 2nd Year

Academicians often appeal to today's parents to groom their children by inculcating tolerance in them so that they could build, rather the destroy, their homes, thus conferring the entire onus of propagating tolerance on the elders of the society. So it appears that tolerance is one of the most important parameters which holds our society together and makes individuals happy. Tolerance in common usage refers to non-interference of a person or a group over the freedom of thinking and behaving of another person or group. Now this is often confused with neutrality and often our parents seem to be non-interfering and non-critical to the extent that the children feel that they are in a Disneyland, in a continuous state of freedom where every action is licensed. Once upon a time tolerance was a noble quality when it fought against the tyranny of religion and puritanism and political dogmatism. Today unfortunately it has attained a confusing connotation mixed with permissiveness. Naturally it is today facing a chargesheet of spreading every possible ills within the society including juvenile delinquency, family breakdowns and substance abuse.

Tolerance, which is at a premium these days, is by the grace of commodification of life often equated with spiritual, moral and emotional vacuum. Add to this, the objective stance of science and we will get the mirror of today's society, as is evident in the network of cable T.V. (Edward Said). Now should we as entrants to 21st century allow the propagation of ethical barrenness?

If the answer is in the negative then one needs immediately to have a proper frame of human nature, what is naturally good for one's own society and how tolerance can be a meaningful ingredient in the recipe of a good society.

That brings us to the ideal of 'tolerance' as it has been developed in history. The earliest known statement of the ideal of tolerance, comes from Pericles delivered to the people of Athens in 5th century B.C., where he declared that we are not suspicious of one another, nor angry with our neighbours if he does what he likes; we do not put on sour looks at him which, though harmless, are not pleasant. But this is exactly what annoyed Plato, (a critic of Democracy), for reasons best known to the logic of a 'closed society' that operated in his mind.

The modern phase of 'tolerance' began in the context of the wars of religion, inquisition, presentation and anti-semitism. So 'tolerance' is a crusade which always had to rally against any officially customised version of social action deriving its succour from the philosophical axioms that the existence which is in error has the same right as that which is not Rallyish like. Faustus Sonicus, Milton, Martin Luther, Bayle, James Harrington, Bentham and Mill et al, have by the end of 19th century secured one thing : ideas from the margin must be respected. The bottom line in the history of tolerance was written by J.S. Mill : 'The only part of the conduct of anyone for which he is amenable to society is that which concerns others. Over himself, over his own mind and body the individual is sovereign.'

Unfortunately, as the idea of tolerance entered the 20th century it slipped into infancy as it was extended to more and more undeserving and disreputable causes, producing ills such as unprecedented white collar crimes production and distribution of pornographic literatures, degradation of taste and manners, glorification of easy virtues, breakdown of families,

children growing up alone and growing into drugs; it seems that the situation is back to square one with liberal individualism delivering miseries to the doorsteps of humanity every morning. Coupled with this is the fierce global economic competition, oil war, debt traps, world wide recesesion, global unemployment, homelessness, neglect of the elderly and the rise of the druglords.

What becomes clear is a fundamental confusion in the concept of tolerance and with this confusion we would hardly be able to do justice to the promises of a good society. As law becomes more restitutive and as it is today considered a remote option for intervention we must have a very clear idea about what should tolerance mean without any ambiguity, for if the frontiers of tolerance is left unchecked it will grow into a Frankenstein and do more harm than good and fail to fulfill the function which it is expected to do.

Teenagers And The Idiot-Box

Saujatya Guin ; XII, Science

We know that out of a life of 18 years we have spent 6 years sleeping and what we don't know is that out of the rest 12 years we have spent more than 2 years watching TV.

The teenager wants to grab every interesting thing around him. They are like sponges. Every idea, every view, every opinion that comes down their way, is received by them eagerly. Naturally everyone in this age is in confusion. The sudden burst of the cocoon of parental care and love exposes them to the world which is not a very nice place. Young minds often cannot distinguish between fantasy and reality. Watching TV as a means of relaxation after a slogging day at school and college is not harmful. But it is important that one should retain a right perspective. The problem is that most teenagers cannot do that with serials like Swabhimaan, Shanti, Junoon, Itihaas, Kuasha Jakhan, Trishna, etc, all on air what are we actually exposed to. Happy families are virtually of an extinct variety. Marital discord, broken families, premarital and extra marital affairs are the trendy masalas intense soaps, we cannot deny that these things are not common in a section of our society. But certainly our Indian social and cultural backbone is not made up of all these.

But the television presents a too much exaggerated form of these supposed-to-be-realities. We are exposed to the darker side of life. All these leads young brains to a sense of insecurity. We keep on worrying, what if these things happen to people around us, to people we love. And that's why serials like Blossom and Beverly Hills 90210 are so popular amongst the young ones. They are not devoid of all the above mentioned things but they also have the sunny side upheld . People like Bronda and Blossom have their own problems which they solve out with the help of their caring and supportive family. But still their society is completely different from that of ours. So certainly the way Brando or Joeye solve their problems isn't the same way we do ours.

Teenage crimes are common these days and again people blame foreign channels for this. But do we forget that Indian soaps are also dripping with blood. Certainly we cannot expect police serials like BYPD Blues or 21 Jump street without violence. But certainly so much use of tomato ketchups in Indian soaps are not that much desirable. Violence is so much common on Indian TV we often forget that people don't always shed blood to conquer over evil. Surprisingly killing is considered as a common way of solving problems or as a means of resolving issues.

Too much exposure to violence can make us think that things are done in this way. On the other hand it may also help us being fearful, aware and have a hatred towards violence. But

it depends on an individual's personality, surrounding and environment in which he grows up or how he is going to take things. But unfortunately the desired effect occurs in rare cases. While talking about TV we cannot neglect the commercial advertisements. With so many commercial breaks in every programme, we surely are too much impressed by these ads. If you want to propose to someone of the opposite sex you will have to brush your teeth with Closeup. If you want to fetch high grades in exams. ask your mom to use Nihar coconut oil. Have a bite of Five Star Cadbury bar, you will be a sure hit in every function. Take a sip of Thumps Up you can go bungee jumping. There is virtually no end to all these. The first three are harmless if you try on. But the third one will lead us to a big question mark.

A good ad should evoke a strong good response from its target audience. It should create a relevance of the product being advertised in the consumer's mind. Instead, today the ads exploit a dormant pre-existing psychological desire inside us. It is the desire to fulfil the expectation of society at large. And that's where we always go wrong.

TV is the popularmost form of media known and naturally expectations from it is higher though it is not always possible to live upto all expectations. But it also has a larger role to play than to just reflect life. It should show what life can be and not just what life actually is. What it desparately needs is an attitude—a positive attitude towards its viewers. But we can not always blame TV for all the evil in our society. Violence and sex existed in our society long before TV was invented. At the same time, it is also true that teenage crimes were let loose after the TV became popular.

Smaller States in India : will that help?

Prof. Sukanta Acharya ; Political Science Dept.

In a number of recently published articles, it has been argues that at the end of the twentieth century two opposing trends of political tension can be discerned. These articles do not mention where. One is the homogenizing trend which seeks to erase all differences of culture. These articles do not mention the homogenization, or, rather, the globalization of economic production and exchange. The other is the assertion of plurality, difference and a demand for recognition of identities fixed in local cultures. These articles do not mention if these local identities have remained fixed in their origin, or they have also changed and become not so local as they were in origin in asserting their pluralities now.

In sociology, there is as well-know concept of secularization. The idea is that with the onset of the process of secularization, local cultural and economic identities are consumed into a larger culture and economy coextensive with society as a whole. Only those elements of local identities and cultures are spared of this consumption which can be worked out to be consistent with the cultural and economic identity of society as a whole. Other cultural and economic identities are left out for their 'natural' death.

A large number of sociologists agree that this process started in Europe in the seventeenth century. Does it not strike one that this process followed the Reformation of Christianity in the sixteenth century which finally constructed Christianity into a monotheism? The Reformation brought Christians more directly under God's own discipline than ever before and reconstrueted the role of the church within the parameters of this discipline. Does it not speak of universalism or 'homogenization' in the largest sense? The question here is:

how could the process of secularization start in the midst of a universalist religion? It has to be remembered that the Reformation not only brought the whole society under God's own discipline, but also reposed to the church matters which were purely enternal and left the other domains of society into the omnibus of the temporal domain. According to most sociologists, it was in this omnibus domain of the temporal that the process of secularization started in the seventeenth century. It is another matter that several writers since Karl Lowith's *Meaning in History* (1949) argued that the process of secularization was actually one of sacralization. It was argued of Descartes, for example, that the science he founded "will take over the function performed upto that point by church dogma, the function of a universal spiritual safeguard for existence". That, however, does not contradict the position that the process of secularization or sacralization, whatever one prefers to call it, erazed local cultural and economic identities, to construct a universal cultural and economic identity, and whatever local cultural and economic identity fitted in with this process, was allowed to survive and expand. The fate of whatever did not fit in was death.

Finally, does it not strike one that closely following the process of secularization, almost in concomitance with it, merchant capital held sway in most parts of Western Europe before the Industrial revolution in the eighteenth century? As in the domain of cultural identities the process of secularization erazed localism and difference, so in the domain of economic production and exchange, norms, techniques and at the end laws emerged which enveloped the entire society. Local forms of economic production and exchange were consumed into these universal norms, techniques and laws as long as thse were compatible, and left out to die for themselves when they were incompatible with these universal norms, techniques and laws.

The state that took the final shape in the nineteenth century was assigned the task of governing the 'civil' society that emerged from the process of secularization. Its function was to enact into laws, where necessary, the homogenized, universal norms in every domain of society including the economic, social and the cultural. No sector of society, no local identity could be spared by the state from governance. The state was organic in the sense that it originated and functioned as much as a part of society as in detachment from it. Civil society retained to itself its rights, primarily to life, liberty and property, to which in the late twentieth century justice was added. The idea was that if the rights to life, liberty, property and justice were ensured to individuals in society, different degrees of each according to different writers, there was nothing else that individuals could demand for within the universe of meanings fixed for each of them.

If one recognized the West European trajectory of modernity, it would appear that the process of secularization leads to a society based on universal values in every sphere of life, from the economic to the political, form the cultural to the ethical. These universal values are constructed not by a single agency, but by a multiplicity of agencies. Moreoever, these multiple agencies are not unidimentional within themselves, but multidimentional. This creates the illusion in most people that there is a scope for plurality in a modern European society. Indeed, there is a scope for majoritarianism and minoritarianism, universal values and local values. It was this illusion which gave birth to certain schools of thought which sought to defend local values thinking that these values still enjoyed an absolute autonomy from the universal values which dominated society. What contributed to this illusion and the schools of thought based on it in the latter part of the twentieth century was the crisis of the European trajectory of modernity which glared in the face of these writers. They defended local values and the idea of justice inherent in them as an alternative to the

universalism of West European modernity. There is no denying the fact that the universalism of European modernity and the forces of homogenization repressed local values, denied justice to most human beings in society, that it worked for only a few in society who benefitted from it. But I would still insist that West European writers who spoke of local values, of justice and defended them did it on the basis of a universalism which underwrote the defence of local values and justice. They could theoretically defend their positions because they took Western universalism as a given, in some cases as an unconscious, which worked under the structure of their theories. the local values they defended were not the local values in their origin, but which were constructed in the womb of universalism of their society and by the forces of homogenization which this universalism unleashed. As Mikhail Bakhtin, who lived and worked in the former Soviet Union, shows, particularly in his *Rabelais and His World*, the universal values in society can only be mocked at, humoured about by those sectors of society, whose local cultures and economic have not yet been consumed by universal values. But that does not provide for an alternative to universal values. In other words, these local cultures and identities have not been able have their voices loud enough to be audible to the defenders of universal values. Those local values and identities whose voices could made audible to the defenders of universalism, already been consumed by these universal values. This is why the British Government had to listen to the demands for autonomy of Scotland and Wales with no great difficulty, in a society which embraced the values of the European Reformation more readily than other societies in Western Europe, initiated the process of secularization before other societies, and was the mother of the Industrial Revolution in Western Europe.

Theoretically, in the Western trajectory of modernity based on universal values, there is no contradiction between universal values and the demands for local autonomy from those sectors of society which have either been consumed by these universal values or are consistent with it . But it does not recognize those local cultural and economic identities which have not yet been consumed by the universal values of modernity.

There is hardly any defence against this repressive universalism of modernity because it is founded on the sciences of life, labour and language. Moreover, the forces of homogenization emanating from this universalism do not operate in a spectacular manner. The multiplicity of agencies which function in dialogue with one another and the multidimentional character of these agencies ensure that this universalism is planted in the minds of individuals in society without their knowledge.

In certain societies and in certain instances, however, the agencies of this universalism do not function in such an ideal-typical form. The typical examples of such societies and instances are German and Italian societies of the 1930s and a part of the 1940s. In such societies, the agencies of universalism are drastically reduced to only a few, or does not grow beyond a few. This inadequacy is sought to be compensated for by the construction of an overblown ideology, which takes over most of the functions of inclusion and exclusion between which a universalism is conceived of in strident terms. The name of this universalism is totalitarianism, if we care to borrow the term from Hannah Arendt. The agencies of totalitarianism function in a spectacular manner. After all, every extremist advocates ideology a spectacular universalism. It seeks to overcome opposition to this universalism through spectacular modes of operation, organization and setting up of an objective. It seeks to accomplish the impossible.

The BJP's proposal for carving out smaller states in India like Uttaranchal, Vananchal and

Chattisgarh would not have appeared to be extraordinary in terms of the usual historical trajectiory of modernity, which we derive from Western Europe. But a suspicion about the real objective of these proposals arises from elsewhere. The Sangh Parivar's founders had a profound faith in totalitarianism. Its *idoology* is as overblown as was that of fascism in the 1930s and a part of the 1940s. But after its partial electoral success in the last decade or so, it has realized that it can neither construct Hinduism as a monotheism, nor can it have a totalizing control all over India in the manner it wanted. So it went in for alliances with other regional politicl parties. But going in for alliances with other parties involves compromises with its own totalitarian *ideology*. It was also aware that regional identities on the basis of which these and other regional parties have emerged on the political scene, are not to be easily erazed by its totalitarian ideology. So it has chalked out a new programme. By creating the three states of Uttaranchal, Vananchal and Chattisgarh it seeks to strengthen the Indian stage apparatus in those regions of India which have not yet been consumed into the universalism of Indian modernity. A larger presence of the state apparatus in these areas, the BJP assumed, would ensure governance these regions more effectively. Moreover, political ideologies in these areas have not been solidifed to such an extent that these would be able to force the BJP to go to the negotiating table for forging alliances. In other words, the ideology of the BJP seeks to infiltrate into these regions more effectively than at present. It remains to be seen what the BJP does in response to demands for the separate states of Boroland, Jharkhand etc. The measures for creating smaller states in India come in a series in the BJP's totalitarian agenda as an instance of a spectacular action after other spectacular actions such as the demolition of the Babri Masjid and the Pokhran nuclear tests.

In defence of those who are repressed by BJP's totalitarianism, it can be said that a real decentralization of political power can at least partially help them to defend their own positions. Creation of smaller states would not really help them, because in that case their own community leader would engage in a trade-off between the totolitarianism or universalism of modernity and their own community interests. It would be better if they engage in this trade-off themselves. This they can do by taking recourse to the rights to life, liberty, property and justice, which are permitted to them within the universalism of modernity. It most human beings in Indian society are able to defend their interests, local cultures and economics in this way, social theorists who are relactant to call Indian society a 'civil' society will be forced to reconsider their positions.

সংসদ বার্তা

আমরা প্রতিশ্রুতিবদ্ধ ছিলাম—আশুতোষ কলেজে যে সুস্থ ও প্রগতিশীলতার বাতাবরণ গড়ে উঠেছে আমাদের পূর্বসূরীদের বহু রক্ত আর ঘামের বিনিময়ে, তাকে রক্ষা করার ক্ষেত্রে। আমরা যে যে অনুষ্ঠানগুলো বিগত এক বছরে করতে সক্ষম হয়েছি, তা হ'ল— নবীন বরণ, বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা, বার্ষিক সাংস্কৃতিক ও কমনরুম প্রতিযোগিতা, অন্তাক্ষরী, রক্তদান শিবির, সোশ্যাল। নবীনবরণ অনুষ্ঠান এক অন্য মাত্রা পায়, সাধারণ ছাত্রছাত্রীদের অভিনীত নাটক আর অঞ্জন দত্ত ও ক্যাকটাসের গানে। কলেজ সোশ্যালও আকর্ষণীয় হয়ে ওঠে ক্যারাটে শো, সাধারণ ছাত্রছাত্রীদের অভিনীত একটি আলেখ্য, আশুতোষ গ্রুপ অব মিউজিক— সত্বা ও নচিকেতার গানে। তা ছাড়াও এ বছর কলেজের প্রতিষ্ঠা দিবসের অনুষ্ঠানে ছাত্র সংসদের পূর্ণসহযোগিতায় ও অংশগ্রহণে এবং অধ্যাপক, অধ্যাপিকা ও ছাত্রছাত্রীদের যৌথ প্রয়াসে আশুতোষ কলেজের সাংস্কৃতিক ভিত্ সুদৃঢ় হয়েছে। প্রত্যেকটা অনুষ্ঠানেই আশুতোষ কলেজের ঐতিহ্যকে আমরা পূর্ণমাত্রায় বজায় রেখেছি।

—আশুতোষ কলেজ ছাত্র সংসদ

প্রচেষ্টা

বিগত ১৯৯৭-৯৮ সালে, ছাত্রসংসদ বিভিন্ন ভাবে তার সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেয় সমাজের কাছে। যারই একপ্রকার প্রকাশ—কিছু দুস্থ ব্যক্তিকে চিকিৎসাখাতে, পড়াশোনাখাতে আর্থিক সাহায্য করা। অর্থের পরিমান হয়তো খুব বেশী নয়—কিন্তু সাধারণ ছাত্রছাত্রী ও সংসদের বিভিন্ন কর্মীর উৎসাহ ও কর্তব্যবোধ থেকে এটাই প্রমানিত হয়েছে—আশুতোষ কলেজের পরিবেশ আজও মানুষের বিপদে পাশে দাঁড়াতে শেখায়। আমরা উল্লেখিত ব্যক্তিদের বিপদে পাশে থাকতে পেরেছি, এটাই আমাদের পাওনা। এ কাজের মধ্যে দয়া ছিল না—ছিল আমাদের দায়বদ্ধতা।

প্রাপকের নাম	ঠিকানা	অর্থসাহায্য
১) অভিষেক সাহা (ছাত্র)	স্কটিশচার্চ স্কুল	৫০০.০০ টাকা
২) গোপালি রায় (শ্রমিক)	গোলপার্ক, ফুটপাথ	১০৫.০০ টাকা
৩) মঞ্জু ঘোষ (মজুর)	কসবা	১৬০.০০ টাকা
৪) পরিতোষ গাঙ্গুলী	খড়দহ, ২৪ পরগনা	১৫৭.০০ টাকা
৫) সনীরণ ব্যানার্জী (অবসর প্রাপ্ত কর্মচারী)	৬১, বি, এন. ব্যানার্জী রোড, কলি-৫৬	৩৩০.০০ টাকা
৬) শ্যামল নন্দী (বেকার)	খড়দহ, কুলীন পাড়া পোঃ বি.ডি সোপান উঃ ২৪ পরগনা	১০০.০০ টাকা
৭) গোপীনাথ মিত্র(রাজমিস্ত্রী)	৩২ নং ওয়ার্ড, পঞ্চাননতলা ঢাকুরিয়া,	২০০.০০ টাকা
৮) *অশোক সরকার (সরকারী কর্মচরী)	চেতলা	১৭২৫.০০ টাকা

অর্থাৎ আটজন ব্যক্তিকে মোট ৩২৭৭.০০ টাকা অর্থসাহায্য করতে আমরা সক্ষম হয়েছি। আগামী দিনে যেন আরও পাশে থাকতে পারি—

সুপ্রিয় বেদজ্ঞ
(সাধারন সম্পাদক—ছাত্রসংসদ)

* অশোক সরকারের জন সংগৃহীত অর্থের ৪০০.০০ টাকা নিউহ্যেটেল থেকে সংগৃহীত হয়েছে।

পরমাণু বোমা বিস্ফোরণের বিরুদ্ধে
আমরা তীব্র ধিক্কার জানাচ্ছি।

পরমাণু বোমা নয় আমরা চাই—
পৃথিবীর প্রত্যেক মানুষের জন্য
শিক্ষা, অন্ন, বস্ত্র ও বাসস্থানের অধিকার।

আমরা চাই বেঁচে থাকার জন্য সুস্থ সংস্কৃতি

আশুতোষ কলেজের পক্ষ থেকে ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ শ্রী সুধীন্দ্র কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক প্রকাশিত, ছাত্রসংসদের সাধারণ সম্পাদক সুপ্রিয় বেদজ্ঞ কর্তৃক প্রচারিত ও বর্ণমালা প্রিন্টার্স (৩৭/১/১, ক্যানেল ওয়েস্ট রোড, কোলকাতা -৭০০ ০০৪) কর্তৃক মুদ্রিত।